শারদীয়া ১৪২৭

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে

কবিতা

নিবন্ধ

ছোটগল্প

বিষয়ভিত্তিক গদ্য

নাটক

শিশুশিল্প

বিশেষ ও নিয়মিত পাতা

দুর্গা হাসেন, দুগ্‌গা কাঁদে

দুর্গা হাসেন, দুগ্‌গা কাঁদে

হিরণ্যগর্ভ
(বাংলা সাহিত্য পত্রিকা)
শারদীয়া ১৪২৭ প্রকাশ: ৫ই কার্তিক, ১৪২৭ (ইংরেজি ২২ শে অক্টোবর, ২০২০)
বিষয়: “দুর্গা হাসেন, দুগ্গা কাঁদে”

প্রকাশক: শুভ্রদেব সেন
সাম্মানিক প্রকাশক: শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার

প্রচ্ছদ: রাজদীপ চক্রবর্তী (হিরণ্যগর্ভ)
অভিশ্রুতি রায় (চরৈবেতি)

© হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস, ১৪২৭

মূল্য: ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা)

‘হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস’
২৩/২০৫, VBHC Vaibhava
আনেকাল মেইন রোড, ব্যাংগালুরু, কর্ণাটক, পিন – ৫৬২ ১০৬
ই-মেল: hiranyagarvo@gmail.com ; ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

বিষয়: **"দুর্গা হাসেন, দুগ্‌গা কাঁদে"**

শারদীয়া ১৪২৭

প্রকাশ: ৫ই কার্তিক, ১৪২৭

ব্যাংগালুরু • শিলিগুড়ি

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

শুভ্রদেব সেন, প্রধান সম্পাদক ১

নিবন্ধ

চন্দরাদের কথা : *জয়শীলা গুহ বাগচী* ২

কবিতা

অকালবোধন: *মনিমা মজুমদার* ৬
পুনর্জাত সংলাপ: *বাবলি সূত্রধর সাহা* ৬
অত্যাগসহন: *মধুমিতা চক্রবর্তী* ৬
আজও করো তুমি অগ্নিস্নান? : *সুমন মল্লিক* ৬
স্বপ্নাদেশ: *অনিরুদ্ধ দেব* ৭
দুগ্গারা বাঁচুক প্রত্যাঘাতে: *রবীন বসু* ৭
শব: *সাত্যকি দাস* ৭
স্মৃতিপথ: *পিঙ্কু চক্রবর্তী* ৮
দুগ্‌গার মাটি: *সুফল বিশ্বাস* ৮

গদ্য

ঠাকুর গড়ার দিনগুলো: *লিপি চক্রবর্তী* ৯
অপরাজিতা: *বেদাংশী* ১১
হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, পরান বান্ধিবি কেমনে: *অনিন্দিতা গুপ্ত রায়* ১২
দুর্গা হাসে, দুগ্গা কাঁদে: *সুব্রত সাহা* ১৫
এস সমারোহে: *মহুয়া চৌধুরী* ১৬

অনুগল্প

শাপমোচন: *সঞ্জয় কুমার নাগ* ১৭
দুগ্‌গার ইচ্ছেপূরণ: *তৃণা কানুনগো* ১৮

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মুক্তগদ্য

ভাসান: *ফড়িং* ১৯

আগমনী আছে: যাজ্ঞসেনী ১৯

নাটক

গুণধর সোরেন ও এক ডাইনির গল্প: *তমোজিৎ রায়* ২০

===

চরৈবেতি

===

নিবন্ধ

একটু অন্য দার্জিলিং: *শৌভিক রায়* ৩০

ভ্রমণ কাহিনি

তরিয়ুক: *মহুয়া মজুমদার* ৩৩

আমার চোখে বাঁকুড়া: *তরুনার্ক লাহা* ৩৪

স্বপ্নের থামগাড়া: *শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার* ৩৬

বিপুল সম্পদের বিষ্ণুপুর: *সত্যম ভট্টাচার্য* ৩৭

বনঘেরী হোম স্টে: গ্রামের শেষ বাড়িটা: *সেমন্তী মিত্র* ৪০

না-দেখা অথচ দেখা ভূগোলের অনুচ্চারিত অক্ষর: *নীলাদ্রি দেব* ৪২

পুকরি লেক: *মিহির দে* ৪৪

সংগীত বিষয়ক

ঝরা পালকের রূপকথা: *মৌসুমি দাশগুপ্ত* ৪৫

বাংলার রন্ধনশিল্প

বাঙালির খাদ্যাভ্যাস: অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ...: *চন্দ্রাশ্রী মিত্র* ৪৬

বাংলার ঔষধি গাছগাছড়া

ঔষধি গাছপালার উপকারিতা: *বিনিতা সরকার* ৪৮

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

==

তুলিকলম

==

কল্পনার সুতোয় বোনা: *সুভম মুখার্জী* ৫০

ছড়া

রক্ষাকর্তা মা দুর্গা: *তমাল দে* ৫০

শিশুশিল্প

অভিপ্সা ব্যানার্জি ৫১
উপাংশু রক্ষিত ৫১
দিবিজা হোড় ৫১
স্বাতন্ত্র্য সেনগুপ্ত ৫২
হৃদিকা দাস ৫২
রাজন্যা শীল ৫২
কঞ্জনাভ মৈত্র ৫৩
রুদ্রনীল সরকার ৫৩
অধ্যায়ন সরকার ৫৪
সুমেধা চক্রবর্তী ৫৪

=========

সম্পাদকীয়

"আমি আসছি তাহলে মা?"
"দুগ্‌গা দুগ্‌গা!"

এটি বাংলার ঘরে ঘরে চলে আসা এক কথোপকথন। বাড়ির বাইরে কেউ পা রাখলে বা দূরে কেউ পাড়ি দিলে এই কামনাই প্রায়শ করা হয় বাংলার হিন্দু মায়েদের পক্ষ থেকে। দুগ্‌গা সহায়! দুগ্‌গাই বাঁচাবে বিপদে আপদে। দুগ্‌গাই স্থির করবেন গন্তব্যের সুখযাত্রার। সে দুগ্‌গাই হোক আর দুর্গা ই হোক, দেখতে আলাদা আলাদা হলেও আসলে তাঁরা একই। যে মা তাঁর প্রিয় সন্তানের উদ্দেশ্যে এই কামনা করেন তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণা দুর্গার সমস্ত গুনেই, কেবলমাত্র তাঁর এই কামনা মন্ত্রের রূপ নেয় ঐশী শক্তির বশে এবং প্রানবন্ত হয়ে অভিলাশ পূর্ণে সহায়ক হয়।

দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। যিনি দুর্গম দৈত্যরূপী বাধাকে দূর করার ক্ষমতা রাখেন-তিনিই তো মা। তিনিই দুগ্‌গা, তিনিই দুর্গা।
দেবীর আরাধনাও এই দুর্গতি নাশ করার উদ্দেশ্যেই। দুর্গা পুজোর সমগ্র চিত্রটি হল একটি রনক্ষেত্রের চিত্র। অসুর মথনে মা ব্যাপৃতা- এক চোখে তাঁর ক্রোধ আর অন্যচোখে করুণা। দুর্গা যেন সমস্ত জগতের পালন করছেন, তাই সুর অসুর সকলেই তাঁর সন্তানতুল্য। শুধুমাত্র ন্যায় ও শান্তির প্রয়োজনে দেবী সন্তানবধে নিষ্করুন হয়েছেন।

ভারতের শক্তিপুজোর প্রচলন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর যুগ থেকে আজ অবধি এই শক্তিপুজোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার শুরুতে অগ্নিই ছিল মানুষের মান্যতায় পবিত্রতম উপাদান। প্রতি ঘরে ঘরে অগ্নি ছিল আরাধনার কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি বৈদিক যুগেও তার প্রমাণ মেলে। যজ্ঞের আগুনের পবিত্র উত্তাপে উজ্জীবিত হত মানুষের প্রাণ আর এই অগ্নি থেকেই তো ধীরে ধীরে সৃষ্টি দুগ্‌গার। তাই দেবী অগ্নিস্বরূপা। শাস্ত্রমতে দক্ষ প্রজাপতি বহু যজ্ঞের সম্পাদন করেন এবং তারমধ্যে এক্ষেত্রে "পার্বতী দক্ষ" যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায় 'শতপথ ব্রাহ্মণে'। দক্ষতনয়া নামক যজ্ঞবেদীর উপর মহাদেব নামক অগ্নির থেকে গৌরীপট্ট ও তার উপর শিবলিঙ্গের ধারণা গঠিত হয়েছে। আবার অগ্নির সপ্ত জিভের কল্পনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষিরা। সপ্তজিহ্বার পৃথক পৃথক নাম ছিল- কালী, মনোজবা, করালী, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলঙ্গীনি ও বিশ্বরুচি। আবার বেদে অমিত সূর্যের জননীরূপে দেবী কল্পিতা। রাত্রিরূপিনী দিতি ও অদিতিই তন্ত্রে আদ্যাশক্তি কালী। বৈদিক যঞ্জকুন্ডে ইনি কারীরূপিনী অগ্নিশিখা।
দেবী আবার স্বয়ং মহারাত্রীরূপা। সৃষ্টি যখন স্তব্ধ হয়ে যায় তখন একা জাগেন দেবী। মহাবিষ্ণুও নিদ্রা নেন কিন্তু দেবী সদা জাগৃতা। তাই বলা হয় প্রতিদিন মানুষ কাজকর্মের শেষে ক্লান্তিদূরের আশায় যার নিশ্চিন্ত আশ্রমে নিদ্রা যায়- সেই দেবীর আশ্রয় থেকেই আবার সকালে উঠে নতুন উদ্যমে কর্মকার্যে ব্যাপৃত হয়।

হিরণ্যগর্ভ'র এই সংখ্যার বিষয় অনেকটাই দেবীর এই মহান রূপের এক সামাজিক বৈপরিত্যকে প্রকাশ করে। এই সংখ্যার লেখনীতে তার বিভিন্ন আঙ্গিককে তুলে ধরার একটি প্রয়াস রইল। আশাকরি 'দেবীসুক্তে' বলা দেবীর নিজস্বরূপকে বুঝতে শারদীয়া সংখ্যা একটু হলেও সহায়ক হবে।
দেবীসুক্তে দেবী বলেছেন -
"আমি রাষ্ট্রী, রাষ্ট্রের অধিশ্বরী। রাজ্যরক্ষার্থে যে সম্পদের প্রয়োজন আমি তারই সৃষ্টিকর্তা। সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রহ্মাজ্ঞান তা আমিই প্রদান করি। আমি এক হয়েও বহুরূপা।"

শুভ্রদেব সেন
প্রধান সম্পাদক

৫ই কার্তিক, ১৪২৭

নিবন্ধ

চন্দ্রাদের কথা

~ জয়শীলা গুহ বাগচী

এই লেখাটা যখন লিখতে বসেছি তখন দুর্গা পুজোর প্রতিমা নির্মাণ প্রায় শেষের পথে। বৃষ্টি যদিও কমেনি, শরতের আকাশ এখনও জলভরা মেঘে নত হয়ে আছে। পুজোর তেমন উৎসাহ আনন্দ নেই এবার। কারণটা অজানা নয় কারুর। গল্পে উপন্যাসে পড়া অতিমারি স্তব্ধ করে দিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন। প্রায় সাত মাস হল স্বাভাবিক কাজকর্মের গতি অনেকটাই শ্লথ। সম্পূর্ণ থেমে থাকা অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে উঠছে লকডাউন। একসময় হয়তো সবই আগের মতোই স্বাভাবিক হবে। কিন্তু হয়তো কোনদিনই স্বাভাবিক হবে না নারী পুরুষের সম্পর্ক। পুরুষজন্মের অহং থেকে পুরুষ নিজেকে আজও বের করতে পারেনি । সারা পৃথিবীতে এই লকডাউন পিরিওডে ক্ষত বিক্ষত কালশিটে পড়া নারী মুখের মিছিল দেখতে হয়েছে সোস্যাল মিডিয়াতে। অথচ এমন তো নয় যে সেই সব নারীরা পিছিয়ে পড়া ,অশিক্ষিত, আর্থিক স্বনির্ভর নয় । এক্ষেত্রে সব ধরণের নারীর পরিণতি একই। দুর্গাপুজো আসছে। অল্প স্বল্প অনুষ্ঠানও হবে। দেবীর কাছে যাবার আগে চড়া মেক আপে বা সুদৃশ্য মাস্কে হয়তো ঢাকা পড়বে মারের চিহ্ন, কিন্তু সমাজের এই ক্ষত ঢাকবে কী? কী দেখে তৈরি হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম? দুর্গাকে আরাধনার আগে আমরা বরং একবার চোখ বুলিয়ে নিই এই খতিয়ানে।

১) করোনার উৎপত্তিস্থল চীনের হুবেই প্রদেশে তিন গুণ বেড়েছে গৃহ হিংসা।

২) ব্রাজিল, ফুটবলের দেশ, সাম্বা নাচের দেশ ,সেখানে গৃহ হিংসা বেড়েছে ৪০-৫০ শতাংশ।

৩) সাইপ্রাস দ্বীপ- লকডাউনে হেল্পলাইন ফোন নং- এ অন্তত তিরিশ শতাংশ বেশি ফোন কল এসেছে । তবে বেশির ভাগ অত্যাচারিতা মেয়েরা ফোনটুকুও করতে পারেনি।

৪) ইটালি- অত্যাচারিতা মেয়েরা হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করেও তাড়াতাড়ি ফোন কেটে দিয়েছে। টেক্সট মেসেজ বা ই-মেল পাওয়া গেছে অনেক বেশি। জানা গেছে এমন একটি মেসেজ এসেছিল যেখানে মেয়েটি নিজেকে বাথরুমে বন্দি করে সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

৫) স্পেনে লকডাউন ছিল অত্যন্ত কড়া, তবু সরকার থেকে মেয়েদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা গৃহ হিংসার কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হন। তা সত্ত্বেও উনিশে মার্চ সে দেশের মানুষ স্বামীর হাতে একটি মেয়েকে খুন হতে দেখেছিল।

৬) জার্মানি – গ্রীন পার্টির এক পার্লামেন্টের সদস্য সরকারের কাছে সরকারের কাছে পর্যাপ্ত অর্থের দাবী করেছেন মেয়েদের সেফ হোমের জন্য। যাতে তারা অত্যাচারী সঙ্গীর হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সেজন্য তিনি হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলি সেফ হোমে রূপান্তরিত করার কথা বলেন।

৭) সিঙ্গাপুর – সাহায্যপ্রার্থী মেয়েদের ফোন কল বেড়েছে তিরিশ শতাংশের বেশি।

৮) অস্ট্রেলিয়া – চল্লিশ শতাংশের বেশি ফ্রন্টলাইন কর্মীদের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন এসেছে।

৯) ফ্রান্সে বেড়েছে তিরিশ শতাংশের বেশি।

১০) আর্জেন্টিনা- বিশে মার্চ থেকে গৃহ হিংসা সংক্রান্ত কল বেড়েছে ২৫ শতাংশ

১১) ইউনাইটেড কিংডম- গৃহ হিংসা বেড়েছে তিন গুণ বেশি। কন্যা শিশুসহ ষোলজনের মৃত্যু হয়েছে।

১২) ভারতবর্ষ - এদেশে মোটামুটি ভাবে ছিয়াশি শতাংশ মহিলা আক্রান্ত তাদের পরিবারের কাছে। অথচ বেশিরভাগই কোন রিপোর্ট হয়নি। তাই যতটুকু রিপোর্ট হয়েছে সেটা আইসবার্গের চূড়া মাত্র।

এইসব পরিসংখ্যান দেখে আমরা বোধহয় অবাক হতেও ভুলে গেছি। এতটাই স্বাভাবিক মনে হয় এসব। নতুন তো কিছু নয়, মেয়েরা মার খেতে অভ্যস্ত। বাইরের জগতে শুধু নয়, নিজের সবচাইতে আপনজনের কাছে। পেশাসূত্রে দশ থেকে আঠারো পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সারাদিন কেটে যায়। তারা বেশিরভাগ প্রান্তিক পরিবারের, আর্থিক এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই তারা পিছিয়ে পড়া। নিরানব্বই ভাগ মুসলিম। ছেলেদের সেকশন ও মেয়েদের সেকশন আলাদা। ছেলেদের ঘরে অতি সক্রিয়তা সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। শহরতলী বলে শহরের ক্লেদ ছেলেদের সাজপোশাক আচার আচরণে স্পষ্ট। আর মেয়েদের ক্লাসে গেলে মনে হয় আমি আশিটি শামুকের সামনে বসে আছি। অথবা তারা কোনদিন কথা বলতেই শেখেনি। বেশিরভাগ দিন সামান্য কমউনিকেশন ছাড়া ক্লাস শেষ হয়। দু একজন কথা বলে। ওরাই ভালো রেজাল্ট করে। বাকিরা প্রতিবছর অন্ধকারে ডুবে যায়। বেশিরভাগ মেয়ে টুয়েলভের পর আর পড়াশোনা করে না। প্রচুর ফেল করে। রোগা রোগা ফ্যাকাশে মুখের মেয়েদের মধ্যে আমি কোন প্রাণের সাড়া খুঁজে পাই না। জীবনের প্রতি জগতের প্রতি কোন সদর্থক মনোভাব দেখতে পাই না। শীতের ঝরা

প্রবন্ধ

জয়শীলা গুহ বাগচী

পাতার মতোই তাদের জন্ম। বিদ্যালয় জীবনের পর কোথায় হারিয়ে যায় তারা। দু'একজনকে দেখি বাচ্চা কোলে, রোগা হাড় জিরজিরে শরীরে একটা সস্তার ঝলমলে শাড়ী জড়ানো। বাড়ীতে হয়তো আরো গোটা পাঁচেক বাচ্চা । সেই কচি মা এখনি শুকিয়ে ওঠা স্তন থেকে নিজের নিঃশেষিত প্রাণশক্তিটুকু দান করছে। আমার ছাত্রী, ওকে এখন একলাইন লিখতে বললে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে। প্রতিদিন চূড়ান্ত হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরি। সারাদিন সবরকম শেখাবার চেষ্টা বিফলে যায়। কতভাবে বাইরের জীবনকে দেখাবার চেষ্টা করি, সব উদাহরণ শেষ হয়ে যায়। তবু হাজার বছরের ঘুম ভাঙে না। ক্লাস এইট থেকেই ওরা মোহরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। কন্যাশ্রীর টাকা পাবার জন্য ইদানিং টুয়েলভ পর্যন্ত মেয়েদের পড়ার হুজুগ বেড়েছে। তবু তার মধ্যেই বেশকিছু পালিয়ে বিয়ে করে। প্রতিবছর মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। শুধু প্রেমজনীত কারণ এর জন্য দায়ী একথা মনে হয় না। হয়তো পারিবারিক শোষণ, শ্লীলতাহানি বা দারিদ্র এর কারণ। প্রতিবার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটার পর এই কথাই ভাবি। তার মধ্যেই দু'চার জন প্রণাম করে যায় ,প্রতিষ্ঠিত মুখের সেইসব আলো দেখে মুগ্ধ হই। তার সংখ্যা হাজারে দু'তিন জন। এত অন্ধকার দেখতে দেখতে ভাবি এইই কী নিয়তি। আমি বা আমার মতো কিছু মেয়েরা কী আলাদা? খুঁজতে থাকি উত্তর। যেহেতু মুসলিম মেয়েদের নিয়ে কথা বললাম, এক্ষেত্রে আরো একটি অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হল। নানা কারণে ব্যস্ত হবার জন্য আমার টিভি বা ওয়েব সিরিজ কোনটাই দেখা হয় না। অতিমারির জন্য দীর্ঘদিন স্কুল ছুটি। কোথাও যাবারও উপায় নেই। একঘেয়েমীতে ভুগছিলাম। ফোনটা ঘাটতে গিয়ে নজরে এল পারস্যের অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর তৈরি করা একটি ওয়েব সিরিজ। তুরস্কের ওপর একটা আলাদা ভালোলাগা আছে। তার কারণ আমার এক প্রিয় লেখক হলেন তুরস্কের ওরহান পামুক। তার দেশের অতীতকে জানার ইচ্ছেতেই দেখতে শুরু করেছিলাম ম্যাগনিফিসেন্ট সেঞ্চুরি নামের ওয়েব সিরিজটি। প্রতিটা এপিসোডেই আশা করেছি এবার হয়তো রাণী হুররেম সুলতানের প্রকৃত উত্থান দেখানো হবে, যা ইতিহাসে রয়েছে। অথচ তাকে যতটা দেখলাম একজন যৌন দাসী কুচক্রী বিছে ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই যৌন দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। শুনেছিলাম হুররেম সুলতান একজন কবি ছিলেন, বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন, অনেক সমাজসেবা করেছেন, রাজসভার কাজে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এই সিরিজটি সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু নারী চরিত্রের এমন বিকৃত ও জঘন্য চিত্রণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। এখান থেকে কী শিক্ষা নেবে আমার কোমলমতি মেয়েরা? এদিক থেকে দেখতে গেলে কোন দেশ ধর্মই পিছিয়ে নেই নারীকে ছোট দেখাবার ব্যাপারে। যে বিষয়টি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল সেইদিকেই চোখ ফেরানো যাক।

দুর্গাকে তৈরি করা হয়েছিল পুরুষেরই প্রয়োজনে। এবং কোথাও বলা নেই দুর্গা নিজের শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। দেবতা এবং ঋষিদের যোগবলে তাঁর শক্তির উদ্ভব। নারী যে নিজের শক্তি থাকতে পারে এই চিন্তাটি প্রথমেই বিসর্জন দেওয়া হল। এবার যার অকাল বোধনে শরতকালে পুজোয় মেতে উঠছি তার গল্পে প্রবেশ করি। আর্য সভ্যতার দম্ভ যার জীবন ছারখার করে দিয়েছিল সেই সীতার কথাই ধরা যাক। রাজপ্রাসাদের আরাম ছেড়ে রাজকন্যা ও রাজবধূটি স্বামীকে ভালোবেসে ,তার দুঃখে সমব্যথী হয়ে বনবাসের সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ সহ্য করেছিল । সেই সমবেদনার একাংশও আর্য পুরুষটি দেখায়নি। রাবণবধে নিজের ইগো চরিতার্থ করেছে সে । প্রথম থেকেই সে সীতাকে অস্বীকার করেছে। রাজ্যবাসীর নিন্দাবাণী অজুহাত মাত্র। নইলে সে কখনোই বলতে পারতো না রাবণ দ্বারা অধিকৃত সীতা রাবণবধের পর লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান যে কাউকে পতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তখনও রাম লঙ্কা ত্যাগ করেনি। সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়েছিল। পুড়ে যাওয়া সীতাকে নির্বাসন দেওয়া ছাড়া আর কিইই বা করতেন। শুধু পত্নীর বেলায় প্রজাবাক্য এমন অমোঘ হয়ে উঠল। এদেশের মহিলারা সীতাকাহিনি শুনবেন নাকি রামকাহিনি? ছোটবেলায় রামায়ণ সিরিয়ালে সীতাকে কাঁদতে দেখে বড়ই বিরক্ত লাগতো। বাড়িতে মহিলাদের তেমন কাঁদতে টাদতে দেখিনি। তারা বেশিরভাগই ছিলেন সবদিক দিয়েই স্বনির্ভর মহিলা। স্কুলে পড়াতে গিয়ে মেয়েদের তাই প্রথম পাঠ এটাই দিয়ে থাকি, প্রত্যেক নারী যেন অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হয়। কিন্তু নিরানব্বই জনই আমাকে বিশ্বাস করে না, যতটা বিশ্বাস করে তাদের গ্রামের চলতি ব্যবস্থাকে। কিছুদিন পরেই স্বামীটি অন্য কাউকে বিয়ে করে বা অন্য কোথাও চলে যায়। সুকুমারি মেয়েগুলি তখন পরিণত হয় নারী শ্রমিকে। কোলে কাঁখে গুটি কয়েক বাচ্চা , যার দায়িত্ব এসে পড়ে সেই অদক্ষ শ্রমিকটির ঘাড়ে। ঘরে বাইরে দুই ক্ষেত্রে তখন তাকে সমানভাবে শ্রমদান করতে হয়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি একই শ্রম দিয়েও মহিলাটি কম টাকা রোজগার করে। এটি শুধু কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান কালের সমস্যা নয়। এটি সর্বকালের সারা পৃথিবীর মহিলাদের সমস্যা। সিমোন দ্য বোভোয়ার তার "সেকেন্ড সেক্স" বইতে

লিখেছেন, " ১৮৮৯-৯৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে ফ্রান্সে নারীশ্রমিকরা দৈনিক মজুরি হিসেবে পেতো পুরুষের মজুরির অর্ধেক। ১৯০৮এর এক অনুসন্ধান অনুসারে ঘন্টাপ্রতি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মজুরি বিশ সাঁতিমের বেশি হত না এবং কখনো কখনো কমে দাঁড়াতো পাঁচ সাঁতিম। ১৯১৮তে আমেরিকায় একজন নারীশ্রমিক পেতো পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক মজুরি। জার্মানিতে কয়লাখনির নারীশ্রমিক কয়লা খোঁড়ার জন্য মজুরি পেতো একজন পুরুষ শ্রমিকের ২৫ ভাগ কম"।

ডাস কাপিটালে এর এক টীকায় মার্ক্স বর্ণনা করেছেন: " উৎপাদনকারী মি, ই... আমাকে জানিয়েছেন তিনি তাঁর তাঁত কলে শুধু নারীদেরই নিয়োগ করেন, তিনি অগ্রাধিকার দেন বিবাহিত নারীদের , আবার তাদের মধ্যে সে নারীদের , বাড়িতে যাদের ভরণপোষণের জন্যে আছে পরিবার, কেননা তারা তাদের শক্তির শেষ কণাটি ক্ষয় করে কাজ করে"।

এইভাবেই বৈষম্য চলে কর্পোরেট জগতেও। সবচেয়ে যোগ্য মেয়েটিকে তার অযোগ্য পুরুষ বসের অধীনে প্রতিদিন সহ্য করতে হয় অসম্মান ও আরো অনেককিছু। বস্তুত মেয়েটির মনোবল ভেঙে দিতেই চালানো হয় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। আটকে যায় পদোন্নতি । তাকে পেছনে রেখে এগিয়ে যায় নিচে থাকা পুরুষ সহকর্মীরা। এইসব গল্প আমাদের জানা। ঘরে বাইরের এই নিষ্পেষণের কথা আরও ভাল জানেন পুরুষরা। হায়ারার্কির অভ্যেস তারা ছাড়বেন কেন? দু'ধরণের রূপে তারা নারীকে দেখতে দেখতে পছন্দ করে, এক, ঘরের সর্বক্ষণের কর্মী, দুই, বাইরের নারী অর্থাৎ বেশ্যা। ঘরের নারীটিকে বন্দী রাখবার কতই না কৌশল । কত পাঁচালি , উপকথা , ছড়ার লাইন তার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছোটবেলায় সবাইকে একটি ছড়া শেখানো হয়। মাত্র চারটে লাইন।

"আতাগাছে তোতা পাখি / ডালিম গাছে মৌ / এত বলি তবু কথা/ কওনা কেন বউ"?

ছোটবেলায় ভাবতাম আহা... বউটি বড় অভিমানী । তখনো জানিনা পরের পংক্তিদুটি কী? পরে জেনেছি কী আশ্চর্য সেই দুটি লাইন। যেখানে বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ মহিলাটির মনের অবস্থা লেখা হয়েছে।- " কথা কব কোন ছলে/ কইতে কথা গা জ্বলে"... যুগ যুগ ধরে সংসার নামক জাতাকলটির মধ্যে পিষ্ট মানুষ প্রতিবাদের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। কারণ পিতৃ তন্ত্রের ফাঁস বেশ সুন্দর ভাবেই নারীর গলায় এঁটে বসেছে। বেশিরভাগ নারীই মনে করে এটি তার অলঙ্কার। এবং বেশিরভাগ সময়ে পরিবারে দুটি নারীর মধ্যে বন্ধুত্বের বদলে বৈরিতার সম্পর্ক দেখা যায়। শাশুড়ি বধূ ননদ মিলে যে গল্পটি রচিত হয় ঘরে ঘরে সেটি আমরা কেউ তলিয়ে ভাবি না। শাশুড়ির নিরাপত্তাহীনতার বোধ এল কোথা থেকে? বধূটি কেনই বা নিজের বাড়িতে না ফিরে মৃত্যু পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকছে। এনিয়ে আরো অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিয়ে দেবার সময় মেয়ের বাবা মা-কে মনে রাখতে হবে যে এই বিয়ে নাও টিকতে পারে। তাই মেয়ের নিরাপত্তার কথা সবার আগে তাদের ভাবা উচিত। গাদাগুচ্ছ লোক খাইয়ে জাঁক দেখিয়ে টাকা ধ্বংস না করে বরং ওই টাকা মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া অনেকবেশি বুদ্ধিমানের কাজ (অবশ্যই শ্বশুরবাড়ির অজান্তে)। এতে যেকোন পরিস্থিতিতে মেয়েটি নিজেকে সুরক্ষিত মনে করবে। আর অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হবার পরই বিয়ের চিন্তা করা দরকার। বাবা মা নিশ্চয়ই তাদের আদরের কন্যাটিকে পরের বাড়িতে মার খাবার জন্য তৈরি করেননি। পিতৃ-তন্ত্র যুগ যুগ ধরে এটিই মাথার মধ্যে গেঁথে দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে গণ্ডগোল অশান্তি হল পারিবারিক বিষয়। যতক্ষণ মৃত্যুর ঘটনাটি না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই গা বাঁচিয়ে চলেন। যেন মারধোর একটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তারই প্রকাশ আমরা দেখলাম এই লকডাউন পিরিওডে। এর পেছনে রয়েছে পিতৃ- তন্ত্রের তৈরি করা মন্ত্র । যা জপতে জপতেই আজও নারীর মস্তিষ্ক প্রক্ষালণ হয়। সব দেশে সব ভাষাতেই এইসব মন্ত্র আছে। যেমন বাংলায় -

বউ জব্দ কিলে
হলুদ জব্দ শিলে

প্রাচীন ইংরেজি ছড়া-

A woman, a horse and a hickory tree

The more you beat'em the better they be

তুলসীদাসের দোঁহায় আছে —

ঢোল গাঁওয়ার শূদ্র পশু নারী
ইয়ে সব হ্যায় তাড়ণকে অধিকারী

নারী কণ্ঠকে থামিয়ে দেবার কত চেষ্টাই না হয়েছে। প্রথম বাঙালি কবি , পরিবেশবিদ খনার জিভ কেটে নেওয়া হয়েছিল। নিজের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে প্রশংসা তো দূরের কথা , যদি সে প্রতিভাময়ী হয় তবে যেকোন উপায়ে সেই প্রতিভাকে নষ্ট করে ফেলা হয়। বৈদিক যুগের প্রথমে এমন পরিস্থিতি ছিল না। উপনিষদের পাতায় আমরা পেয়েছি বেদজ্ঞ গার্গীকে। যিনি আর এক বেদজ্ঞ ঋষি যাগ্যবল্কের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। জনক রাজা ঘোষণা করেছিলেন শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞকে একহাজার গরু দান করবেন। যাগ্যবল্ক শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন পুরস্কার গ্রহণ করতে । স্বাভাবিক ভাবেই সভাস্থলে বিশৃঙ্খলা হয়। সে সময় যাগ্যবল্ককে পরীক্ষা নিয়েছিলেন গার্গী। এবং ঘোষণা করেছিলেন পুরস্কারের

যোগ্য প্রার্থী হিসেবে। যিনি পরীক্ষা নেন তার শ্রেষ্ঠত্বের বিচার বহু আগেই সম্পন্ন হয়েছে। সে কারণেই তিনি পরীক্ষক। অথচ পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েদের বলা হল পড়াশোনা শেখা মহা পাপ। পুরাণে লেখা হল পড়লে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে এতগুলো বছর কেড়ে নেওয়া হল মেয়েদের কাছ থেকে। কেট মিলেট বলেন, "বলপ্রয়োগের শাসনের ওপর নির্ভর না করলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুঁতো , এমনকী অকেজো হয়ে যেতে পারত"।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর "নারীহিংসার দেশে" প্রবন্ধে বলেছেন, " বাইরের হিংসা যত জানা যায় ঘরের হিংসা ততই চাপা থাকে। কোথায় কোন ঘরের কোণে রক্ত ঝরছে, গর্ভে লাথি পড়ছে, কন্যাভ্রূণ খুন হচ্ছে, দাম্পত্যশয্যায় বিকৃতকামীর বলাৎকারের শিকার হচ্ছে মেয়েরা, কন্যাশিশুকে অহেতুক পীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে, তার কটা জানা যায়"। রবীন্দ্রনাথের শাস্তি গল্পে যে তীব্র অভিমান চন্দরার মধ্যে দেখি এবং গৃহ হিংসার যে ভয়ানক চিত্র তিনি দেখিয়েছেন তা আমাদের বাকরহিত করে দেয়।

দেশে বিদেশে করোনা পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হচ্ছে। লকডাউন আর নেই, এই নিও নরম্যাল পরিস্থিতিতে কয়েকমাস আগেই ঘটে যাওয়া গৃহ হিংসার পরিসংখ্যানগুলো যাতে শুধু মাত্র সংখ্যা না হয়ে থাকে তার দায় সবাইকেই নিতে হবে। এবং অনেকবেশি সচেতন হতে হবে মেয়েদের। স্কুলে অনলাইন ক্লাসে কিছু মেয়েকে পাই, যাদের প্রোফাইল ছবিগুলো হামেশাই নজরে আসে। মাঝে মাঝেই ওরা বিয়ের কনের সাজে ছবি তুলে প্রোফাইলে দেয়। সত্যি মেক-আপ নাকি ফটোশপ বুঝি না। কিন্তু ছবিগুলো দেখে ভয় পাই , এখনো আঠারো বছর হয়নি ওদের। গোটা জীবন পড়ে আছে। কত এগিয়ে যাবার আছে। কত কী করার আছে। অথচ সেই চির পুরনো ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে দেখে কষ্ট হয়। গ্রামের সরলমতি মেয়ে সব, কী আছে ভবিষ্যতে কে জানে। বিয়ের মোহময় সাজগোজের ভেতর নিভৃত ব্ল্যাকহোলের খবর ওরা জানে না। ওদের পড়াই, গল্পের মতো করে জীবন বোঝাবার চেষ্টা করি, কিশোরী মন এই যৎসামান্য আলোটুকু বহন করুক। সূর্য না হোক যেন জোনাকীর মতো নিজের আলোয় আলোকিত হতে পারে এইটুকুই প্রার্থনা করি।

"তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোট হয়ে
নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো সবায়
আপন করে ফেলেছ"।।

ঋণ স্বীকার :

- *গদ্য সমগ্র , মল্লিকা সেনগুপ্ত*
- *সেকেন্ড সেক্স, সিমোন দ্য বোভোয়া*
- *আন্তর্জাল*

****

কবিতা

অকালবোধন

~ মনিমা মজুমদার

এক হাতে
কালিমাখা অন্ধকারে ধোঁয়ার শরীর
কুণ্ডলী পাকিয়ে অবিরাম চেষ্টা পাহাড় বেয়ে উঠবার

অন্য হাতে
ধরিত্রী প্রকৃতি প্রতিদিন সেজে ওঠে
হিরন্ময় আলোর ছটায়

সংখ্যাহীন মৃত্যুর পরেও
চোখদুটি খোলা থাকে অবিরত
দেহের জ্বরে নদীতে রেখে আসে জীবন
নারী, পূর্ণ হয় সৃষ্টির বৃষ্টিধারায়
নারী, ছিন্ন হতে পারে নদী বানভাসি হলে

পুনর্জাত সংলাপ

~ বাবলি সূত্রধর সাহা

কত আর জল ঝরাবে তুমি!
চোখের প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ন শ্যাওলা,
নোনা স্রোতে কি যন্ত্রনা
আরও বিস্ফারিত হয়!
জতুগৃহের উপকথার মতো।
আর বেশি শব্দ আড়াল কোরোনা
ঠোঁটের ভাঁজে তো নীলচে কলঙ্ক
জেগে থাকে।
বিষাক্ত সন্দেহে নাকি পাঁজর জ্বলে যায়!
সম্মোহিত ডাইনির মতো!
তুমি তো ভগ্নাংশ নও, সম্পূর্ন নির্মাণ,
জীবনের কালচক্রে।
বিভাজিত আয়ুসন্ধিতে অকপট
সমর্পনও নও।
আর একটু সুখ লেখ তুমি;
পড়ন্ত বেলায় যে অভিশাপ জন্ম নেয়,
পুনর্জাত সংলাপে বুঝি
জীবন লেখা যায়!
উদ্ভাসিত পান্ডুলিপির মতো।

অত্যাগসহন

~ মধুমিতা চক্রবর্তী

সে এক শীতল প্রলেপ, যেন কত ভালো রেখেছি তোমায়!
দশভূজা, দেবীতে সঙ্গায়িত করে আগুন জ্বেলেছি প্রত্যহের যাপনে
তবু পোড়া হাতে বরাভয় দাও, দাও নির্ভরতা
ঝলসানো মুখে জ্বালো ঐশ্বরিক আলো
বিশ্বাস উড়ে যায় যেন ঠিক শিমুলের তুলো

সিঁড়িঘরে একা একা আঁচল ভিজিয়ে এসে বলো
বড় ভালো আছি।

গাছের পাতারা কাঁপে। কেঁদে ওঠে নদী জল।
তিতিক্ষার সংসারে জাগে বঞ্চনা, আরোপিত ছল।

আজও করো তুমি অগ্নিস্নান?

~ সুমন মল্লিক

ঋতুচক্রের ভেতর দিয়ে তুমি হেঁটে চলেছো,
ফুল ও কাঁটার ভেতর দিয়ে তুমি হেঁটে চলেছো,
জল ও আগুনের ভেতর দিয়ে তুমি হেঁটে চলেছো...
অনন্ত এই হেঁটে চলার ভেতর
নিথর বসে আছে কেউ?
তোমার রক্তিম ওড়নায় এখনও কি
ঈশ্বর অশ্রু মোছেন?
স্মৃতির আয়ু খুব অল্প কয়েকদিনের হয়,
বেদনার আয়ু আরও কম,
তার চেয়েও অনেক কম হ'ল প্রতিবাদের আয়ু।

প্রতি বর্ষপূর্তিতে তুমি কি মোমবাতি হাতে হাঁটো?
হাঁটতে হাঁটতে খুঁজে পাও আরও মোমবাতি-হাত?
রাত্রি নেমে এলে যে পুণ্যভূমি হয়ে যায় নরকস্থান,
তার ঠিক মাঝে

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

কবিতা

স্বপ্নাদেশ

~ অনিরুদ্ধ দেব

নিভে যাওয়া সভ্যতার রূপ
মলিন কাপড়ে দাগ হয়ে, ঝরে পড়ে
করুণ রাতে
সময়ের অশেষ জয় যাত্রায়
ঠাঁই পায়,
গোলাপী ভালোবাসায়,
কাঁচের চোখে ফ্যাকাসে চাপ...
নারী মাংস ছিড়ে খেয়েও
অভুক্ত কুকুর মেতে উঠে মূর্তিতে, শারদীয়ায়।

দুগ্গারা বাঁচুক প্রত্যাঘাতে

~ রবীন বসু

এক দুর্গা উৎসবে আসেন, আর এক দুগ্গা কাঁদে
এক দুর্গা পূজা পাচ্ছেন অন্য দুগ্গা পড়ছে ফাঁদে।

ছেলেপিলে ভরা সংসার অভয়া মার দশটি হাত
অন্য দুগ্গা গাঁয়ের কইন্যা ক্ষুধায় কাতর শূন্য পাত।

আসেন দুর্গা সেজেগুজে বাপের বাড়ি বাংলাদেশ
অনেক দুগ্গা পাচার হচ্ছে ভারতবর্ষের ভিন প্রদেশ।

এই মা দুর্গা এসোগো তুমি, থিমপুজো আর প্যান্ডেলে
আগের বছর সপ্তমীতে দুগ্গা পোড়ায় কারা ব্যান্ডেলে?

যারা পোড়াক যারা জ্বালাক, সেই অসুর যে ভয়ঙ্কর
দুগ্গা কাঁদে, দুর্গা হাসেন, তাঁর ত্রিশূল হয়না প্রলয়ঙ্কর।

বিসর্জনে যাবেন যে দুর্গা, ঢাকের বাদ্যি বাজছে খুব
অনেক অসুর ঘাপটি মারে, অনেক দুগ্গা হবে লুট।

তুমি দুর্গা এসো এইবার, এসো শক্তিপুঞ্জ ধরে হাতে
আশীর্বাদ দাও মাগো তুমি, দুগ্গারা বাঁচুক প্রত্যাঘাতে।

শব

~ সাত্যকি দাস

কাঁচের গা ঘেঁষে নেমে আসে বৃষ্টি আর
রাস্তা ধুয়ে যায়
বিলাসী কাঁচ, তোমার শরীরের মত নয়
হাতে ঘা, পায়ে দাগ সময়ের
মাথায় বোঁচকা বেঁধে সমস্ত আকাশ নিয়ে চলেছ তুমি
কোমরের কাছে বেঁধে নিয়েছ
আমাদের চলতি দুঃখ
তোমার শরীর থেকে পাথর পাথর গন্ধ নেমে আসে
আর রক্ত নেমে আসে গুহা গহ্বর ভেদ করে
রক্তে ভিজে যাচ্ছে রাস্তার শরীর
যেমন কাঁচের থেকে নেমে আসা জলে ভিজে গেছিল
হাতে ধরে রেখেছ ছোট্ট ভ্রূণ নবতি কিশলয়ের
আমরা চোখ মেলে দেখি রাস্তা আর শরীর

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

কবিতা

স্মৃতিপথ
~ পিঙ্কু চক্রবর্তী

সে এক অদ্ভুত ভালো লাগার দিন ছিলো,
ভেতরে বইতো দমকা হাওয়া।
কখনো অপেক্ষায় গান গেয়েছি, আবার কখনো চারা গাছের যত্ন নিয়েছি,
ফুল ফুটলে প্রথম খবরটা তোমার কাছে পৌঁছে দেবো বলে।
ঘুম না এলে চোখের পাতায় জড়ো হতো অনেক স্বপ্ন।

আজ বিষাদের দিনে সেই সব স্মৃতি বড্ড ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

বহুদিন পর সেই পথে আজ একলা আমি,
সমস্ত চেনা পথ কেমন অচেনা হয়ে গেছে।

একসময় তুমি ছিলে এই পথের সাথী,
আজ সব বদলে গেছে, আধুনিকতার ছোঁয়ায়।

তবু স্মৃতি তো আজও একই থেকে গেছে,
কিছু ভুলে গেছি, কিছু ভুলতে পারিনি...
হয়তো ভুলতে চাইনি।

আলোর পথে অনেক ভিড়,
তাইতো অন্ধকার বেশি আপন হয়েছে।
সমস্ত অভিযোগ, অভিমান, রাতের শিরায় শিরায় বয়ে বেড়াই।
ফিকে হয়ে যাওয়া সম্পর্কের সহজ কথা গুলো যখন চোখ বুজে নেয়,
তখন তুমি মায়াবী রাত্রি হয়ে ওঠো,
যার মোহ ত্যাগ করা যায় না কখনো ... কেবল শোক থেকে যায়।

দুগ্গার মাটি
~ সুফল বিশ্বাস

ছায়াটা বিরাট বিকট আকাশের মতো
দেখতে অনেকটা ব্যাঙ থাকা ছাতার মতো
বহুদিন ধরে যা যত্নে বানিয়ে এসেছি আমি।
তার নিচে প্রচুর নারী নগ্নদেহশব কিন্তু পূর্ণ নারী নয়
সুস্পষ্ট রেখায়িত লোভাতুর গোষ্ঠী নামও আছে তার।
কিন্তু যারা ছায়াতে জিরতে আসে তাদের কোনো
নামে ডাকা হয়নি বহুকাল।
সেখানে নগর সুলভে মেলে নাগরিক নয়,
গাছ? সেও আছে তবে বড়ো অদ্ভুত
তার নীচে প্রেম বসে না ফিসফিসানীতে।
ডিমের খোলা ভাঙার আঁঠালো গন্ধ পেয়ে
ধেয়ে আসা লালপিঁপড়ের করাত দিয়ে দাঁত ঘষার শব্দ,
কিছুই মেলে না।

তবে ঘোলা জলে শ্যাওলারা স্নান করে,
সন্ধ্যের ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ভোরে ছাড়া পাওয়া
হাসেদের মতো।

এক্কেবারে শেষ রাতের দিকে যে তারারা খসে পরে
পরের দিন তারা চুল শুকায় রোদকবিতায়।
আমি বহুদিন ধরেই জানি
পেছনটা উল্টিয়ে সদ্য কিশোর বকেরা
বিগত যৌবনার ভেজাশাড়ির আঁকিবুকি দেখে
ফেরার হয়েছে বহুদিন।

ছায়ার তলায় জলপাই রঙের মধ্যে
সে আলোচনাও স্পষ্ট অভ্রভেদী-
আসলে কথা আর কাহিনীকে
অনেকদিন হলো সেভাবে বিয়েপুকুর পেরোতে হয়নি।
তাই কথাদের হাতে নিয়েই নেংটিরা আসলেও
সে জানে যে সব কথা গল্পের জন্য জন্মায় না ...

ইতিহাসের একপেশে প্রেমাবেগে, ধেড়েদের নামের বদল হয়
ছায়াদের নয়।

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

গদ্য

ঠাকুর গড়ার দিনগুলো

~ লিপি চক্রবর্তী

আগমনী গান এখন মঞ্চে আর টেলিভিশনের পর্দায় সীমাবদ্ধ। কাশফুল দেখতে ইচ্ছে হলে হাতে সময় বেঁধে নিয়ে ছুটতে হয় ট্রেনে, বাসে বা গাড়িতে চেপে। মা দুর্গার পুজো প্যান্ডেলে থিমের ঠাকুর না হলে ভিড় নেই আজকাল। আমরা বড় বেশি আধুনিক, নাকি বলব উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছি, কে জানে। তাই ঈশ্বর হয়তো কান ধরে আমাদের রূঢ় বাস্তবটার চিত্র দেখিয়ে দিচ্ছেন এই বছর, বাঙালির একমাত্র হৃদয়ের উৎসবকে অস্বস্তির মধ্যে বেঁধে ফেলে। তবু মা দুর্গার আগমন সূচিত হয়।

প্রত্যেক আরম্ভেরই আরম্ভ থাকে, তা সে যে কোনো কাজেরই হোক না কেন। দুর্গা পুজোর আরম্ভ তেমনই হয় কুমোরটুলি থেকে। প্যান্ডেল বা ঠাকুর - যে কোনো থিমের শুরুটাই কুমোরটুলিতে।
এখানে পরিকল্পনা করার জন্য রয়েছেন প্রতিমা শিল্পীরা। দূর দূরান্ত থেকে প্রতিমা বানানোর জন্য কাজের আশায় আসেন অনেক মানুষ। তাঁরা ঠাকুর গড়ার বিভিন্ন কাজে যোগ দেন। এক এক জন তাঁদের দক্ষতা অনুযায়ী এক এক রকম কাজ করেন।
বড় বড় স্টুডিওতে জানুয়ারি মাসের শেষ বা ফেব্রুয়ারি থেকেই সাজ সাজ রব শুরু হয়ে যায়। কারণ জুন মাসের শেষ থেকে মা দুর্গা হাসতে হাসতে বিদেশে পাড়ি দিতে শুরু করেন। বিদেশে পাড়ি দেওয়া মা দুর্গার মূর্তিগুলো মাটির নয়, হয় ফাইবারের। কারণটা অবশ্যই মাটির মূর্তির ভেঙে যাওয়ার ভয় এবং ওজন অতিরিক্ত হয়ে গেলে বহন - খরচ বেড়ে যাওয়ার চিন্তা।
গত বছরের কুমোররটুলির কথায় আসা যাক। দুপুর এগারোটায় পৌঁছেছিলাম কলকাতার এক বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পীর স্টুডিওতে। শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল। কলকাতার এবং আশেপাশের যত নামি পুজো আছে, এমনকি উত্তরবঙ্গেও, তার অর্ধেকের বেশি ঠাকুর যায় এই স্টুডিও থেকে। থিমের ঠাকুর থেকে সাবেকি ঠাকুর, সব রকম মূর্তি রয়েছে তাঁর স্টুডিওতে। আমরা যখন পৌঁছেছিলাম, তখন বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন কয়েকজন মা দুর্গা। বাকিরা বসত করার জন্য প্রস্তুত বাংলার মাটিতেই। প্রতি বছর সত্তরটা ঠাকুর গড়েন তিনি। তাঁর কারিগররা নিশ্চিন্তে রয়ে যান প্রায় ছয়মাস। ঠাকুর গড়ার উৎসব শেষে মায়ের বোধনের আগেই ফিরে যান তাঁরা নিজের বসত বাড়ির আঙিনায়।
এই বছর সেই কর্মযজ্ঞে ভাঁটা পড়েছে অনেক। ঠাকুর গড়েছেন অনেকগুলোই। কিন্তু তবুও সুর তাল লয় কেটে গিয়েছে আগের বছরগুলোর আনন্দ থেকে।
সারা পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, ভারতের যে কোনো রাজ্যে দুর্গা মূর্তি যায় যেখান থেকে সেই সাবেক কুমোরটুলিতে অন্যান্য বছরে পুজোর আগে গেলে হাঁটা সহজ হত না। কি বিশাল কর্মকাণ্ড যে চলত সে বর্ণনা করা কঠিন। রাখাল পাল, গৌরাঙ্গ পাল, মোহনবাঁশি রুদ্র পাল, সনাতন রুদ্র পাল, প্রথম মহিলা মূর্তি শিল্পী চায়না পাল--- আরো কত নাম করব, সকলের স্টুডিওতে সেজে উঠছেন মা দুর্গা। নিবিষ্ট মনে শিল্পী কারিগররা তৈরি করে চলেছেন দেবী প্রতিমাদের। পাহাড় প্রমাণ খড়, মাটি, তুলি, জল, রং চারিদিকে ছড়ানো। আমাদের মতো লেখা- শ্রমিকরা ঘুরঘুর করছে কিছু নতুনত্বের আশায়। কথা বলা তো দূরস্থান, দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না কারিগররা। কোনো কোনো শিল্পী আছেন যাঁরা ছাঁচের মুখ পছন্দ করেন না, প্রতিটি দেবীমুখ তৈরি করেন আলাদা আলাদা ভাবে নিজের হাতে। কেউ আবার চোদ্দ থেকে ষোলো ফুট উচ্চতার নিচে ঠাকুর গড়েন না। কোনো শিল্পী সাতটির বেশি ঠাকুর তৈরি করবেনই না।

কুমোরটুলির প্রথম মহিলা শিল্পী চায়না পাল একচালির মূর্তি বানান। আলাদা আলাদা ভাবে সন্তান সহ দেবমূর্তি তিনি তৈরি করেন না। যে শিল্পীর মূর্তি বিগত বছরে পুরস্কার পেয়েছিল, তাঁর মূর্তির চাহিদা থাকত তুঙ্গে।
শুধু মূর্তি নাকি, ঠাকুরের আবার গয়নার কত রকমফের। কারো গয়না মাটির, কোনো মায়ের রুপোলি জরির গয়না তো কারো আবার সোনালি জরির সাজ। কোনো মা মাটির শাড়িতে সজ্জিতা আবার সত্যি শাড়িতে ভূষিতা কোনো দুগ্গা মা। দূরে যাবে যে মূর্তিগুলো তাদের আবার তারাহুড়ো থাকে। মূর্তিগুলো বাঁকে বসিয়ে চারজন মিলে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে গাড়ির দিকে। কেউ মাটি মেখে চলেছে তো চলেছেই। সে এক এলাহি কাণ্ড।
এত বছর ধরে মা দুর্গা হাসতে হাসতে প্যান্ডেলে যান আর তাঁকে উপলক্ষ করে হেসে ওঠে একটা গোটা জাতি। উৎসবে মেতে ওঠে পুরো প্রকৃতি। কুমোরটুলি খালি করে দেবী মূর্তি বিদায় নিলে থমথমে হয়ে ওঠে শিল্পী কারিগরদের মন। যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির পথে রওনা করে দিলেন তাঁরা। এমন কথাই তো বলেন শিল্পীরা।
এই বছর সব যেন পাল্টে গেল। কত রকমের কাজ জড়িয়ে রয়েছে

গদ্য লিপি চক্রবর্তী

এই বাৎসরিক উৎসবের সঙ্গে। আলো, প্যান্ডেল, চাষবাস, বয়ন শিল্প, বাঁশ, কাঠ, ডেকোরেটর, খড়, মাটি, জরি, চুমকি, শোলা, পুরোহিত, যানবাহন--- প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে দুর্গাপুজোর যোগাযোগ। প্রতি ক্ষেত্রে রয়েছে একটা আয়- ব্যয়ের হিসেব। উপার্জনের হিসেব। সব গোলমাল হয়ে গেল। তবে হচ্ছে, থিমের পুজোও হচ্ছে। কিন্তু প্রাণ কই!

শহর ছাড়িয়ে একটু মফস্বল এলাকায় গিয়েছিলাম। চোখে পড়ল এক ছোট্ট কুমোরটুলি। তাদের কাছে জানতে পারা গেল, এই বছরও ঠাকুরের জন্য বায়না হচ্ছে। হয়তো কয়েকটি ঠাকুরের বেশি বায়না হয়েছে। কিন্তু চালচিত্র নিয়ে নয় ফুটের বেশি উচ্চতা কেউ চাইছেন না। বাজেট কম পুজোর।

একটা কথা মনে এল। গঙ্গার কাছাকাছি যে সমস্ত কুমোরটুলি আছে সেখানে নৌকায় করে এঁটেল মাটি আসে। সেই মাটি দিয়ে ঠাকুর বানালে মূর্তিতে ফাটল ধরে না। এই মাটিই পছন্দ করেন বেশিরভাগ শিল্পী। গঙ্গা থেকে দূরে যে সব কুমোরটুলি আছে তার কারিগররা তো এই মাটি পান না। তাঁরা লরির মাটি কেনেন। লরির মাটির দাম অবশ্য নৌকায় আসা মাটির থেকে কম। কিন্তু গুণগত মান ভালো নয়। কারণ যাই হোক, মাটির ব্যবহার কম হচ্ছে এবার। এখানেও রুটি রুজিতে টান পড়ছে কোনো এক ক্ষেত্রের মানুষের।

রোজগারে ভাঁটা পড়ার কারণ আরো আছে। এবার একচালির মূর্তির চাহিদা বেশি। সেখানেও বাজেটে টান। আর যেহেতু মানুষ বুঝতে পারছেন, এই বছর ঠাকুর দেখতে হয়তো যাওয়া হবে না, পাড়ার মণ্ডপে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া মুশকিল, তাই ফ্ল্যাটবাড়ি বা হাউসিং সোসাইটিতে পুজোর সংখ্যা একটু বেড়েছে। কিন্তু তাতে ছোট ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণ হবে না বলেই আন্দাজ করা যায়।

বড় বড় কুমোরটুলিতে চিত্রটা আরো কষ্টকর। পুজো হবে কিনা, এই সংশয়ে কুমোরটুলি ঝিমিয়ে ছিল আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত। একটা দুটো ঠাকুর, যে গুলো অনেক আগেই বায়না হয়ে যায়, সেগুলোই তৈরি হচ্ছিল ঢিমে তেতালে। নড়বড়ে প্রায় জনমানবহীন কুমোরটুলিতে বিষাদও স্তব্ধ হয়ে ছিল। অলক্ষে বসে দুগ্গা মায়ের চোখেও হয়তো জল এসেছিল। কুমোরটুলি এখন খানিকটা নড়েচড়ে বসেছে বটে, কিন্তু প্রাণ সঞ্চার এখনো হচ্ছে না। এখন সবে ক্লাব কর্তারা একটা দুটো ঠাকুরের অর্ডার দিচ্ছেন। তাও সে রকম উল্লেখযোগ্য নয়।

এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত যত রকমের পেশার মানুষ আছেন, তাঁদের ঘরেও রয়েছেন অনেকগুলি মা দুগ্গা। মা, বউ, মেয়ের রূপে। তারাও বসে আছে দুগ্গা মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করবে বলে। পৃথিবী নিশ্চই আবার ছন্দে ফিরবে। ঠাকুর দেখতে বেরোবে উৎসাহীর দল, কিন্তু পৃথিবী নিজেকে উল্টে পাল্টে নিয়ে, মা দুর্গার বুকের ভিতর কত কান্না চাপা দিয়ে, প্যান্ডেলের মূর্তির মুখে এক টুকরো হাসি বুলিয়ে দেবে, তার হিসেব করার সাধ্য আমাদের কই। তবু মায়ের মূর্তি সেজে উঠুক।

মা দুর্গার মুখের হাসি আলোয় ফেরাবে আমাদের- এই আশায় থাকব। প্রতি বছরের মতোই দুর্গা আসবেন, হাসাবেন, কাঁদাবেন, আর আমরা বিহ্বল হয়ে সেই " শক্তিরূপেন সংস্থিতা"র আরাধনায় মগ্ন হব। শ্রী আরবিন্দকে অনুসরণ করে বলতে চাইব -"মাতঃ দুর্গে, তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না..."।

****

গদ্য

অপরাজিতা

~ বেদাংশী

ঘুম ঘুম চোখ মেলে দেখি এখনো আলো ফোটেনি। আধো আলো আধো অন্ধকারে শুয়ে আছি। জানলার অপরাজিতা গাছ টা দুলে দুলে উঠছে। সবুজ অবুঝ দু একটা কচি পাতা উড়ে এলো। আহা, সই, আজ কি কোজাগরী? কে কে জেগে আছে? সারারাত......?

লক্ষী ঘরে আসবে বলে। এখন আকাশ জুড়ে জোৎস্না। আজ পূর্ণ শশী। এক এক করে ষোল কলা পূর্ণ হলো যে। এক একটি কলায় জীবনের এক একটা পর্ব পার হয় নারী। কন্যা, বধু, মা .... কোথায় জমিয়ে রাখে নিজস্ব বোধ বুদ্ধি আত্মসম্মান? হৃদয় সিন্দুকের চাবির গোছা কোথায়?

অপরাজিতা। মানব পূজারী। নারী পুরুষ নির্বিশেষে। মানবতার পূজারী। পূজারী মানব ধর্মের। আকাল দুর্ভিক্ষের মাঠে একা হেঁটে যায় নীল বসনা। যেন রাধা। চন্ডীদাস দেখেন অপরাজিতার অভিসার। একলা বর্ষণ মুখর রাতে কাদা পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাধা। অথচ কৃষ্ণ তখন অন্য কোথাও, অন্য কোনো খানে। যুগ যুগান্তর ধরে অপরাজিতার এই যাত্রা টুকু বড় সত্য। কেউ দেখে ,কেউ দেখে না। নন্দিনীর বিশু পাগল হওয়া তো সব মানুষের কম্ম নয়। আর ধর্মের কথা তো ঐ সেই এক নিজের শক্তি, আত্মশক্তি, অন্তরের আত্মা থেকে উৎসারিত শক্তি। ক্ষণজন্মা মহামায়া কোথাও কোথাও বলে যান "তোমারে বঁদিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"।

মহামায়ার কথা সত্য হয়। সত্য হয় খনার বচন। ইতিহাস বারবার দেখে আজন্ম পিপাসা নিয়ে নারী শুধু বারি দান করেছে। স্নিগ্ধতার, ক্লান্তির, অবসন্নতার, প্রশান্তির। নাটোর আমার ঘরের পাশেই। বনলতা আমার পরমাত্মীয়। আন্দোলিত হৃদয়ের দোলাচলে কোথায় যে আওভান দেখা দিলো কে জানে !!!!

ভোরের দরজা খুলে দেখি সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, বিশাখা, কুন্তী, গান্ধারী, মেনকা, চিত্রাঙ্গদা সবাই একই সারিতে দাঁড়িয়ে। রাজসূয় যজ্ঞ অবসান করে গঙ্গা সইয়ের কাছে এসেছে দু চারটে প্রাণের কথা বলবে বলে।

মাগো! কার্তিকের ভোরে শিউলি ঝরে যাবার জন্যই তো ফোটে। আমরা হেঁটে যাই এক জন্মদিন থেকে অন্য জন্মান্তরে। পালটে যায় স্থান, কাল, নাম, গোত্র। অথচ মন্ত্র উচ্চারণ একটাই -

"যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমতায়, ভালো মন্দ মিশায়ে সকলি, এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

ক্ষমা বড় গভীর উচ্চারণ। অথচ মুখরিত নয়। এই উচ্চারণ আত্মজাগরণের, আত্মতৃপ্তির, আত্মশুদ্ধির। অপরাজিতা, অপরাজিত থেকে যায় বৈদিক থেকে কলি যুগে।

****

গদ্য

হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, পরান বান্ধিবি কেমনে

~ অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

প্রাণপ্রিয় সই উমা,

আমার শিউলিফুল,

প্রতিবৎসরের মত এইবারও তোমার পিত্রালয়ে আসিবার সময় হইয়া এলো। পঞ্জিকায় আজ ঠিক কত তারিখ আমি বলিতে পারিব না। বরাবরের মতই সুর্যের তাপ ও বেলার পরিমাপ দেখিয়া আন্দাজ করিতেছি ঋতুবদল হইতেছে। ভোরের আলোর রঙ নরম হইয়া আসিতেছে। বাগানের ঘাসপাতাগুলি শিশিরে ভিজিয়া থাকে যেন নারিকেলপাতাগুলি সমস্ত রাত্রি চোখের জল ফেলিয়াছে। আচ্ছা তুমি কি বলিতে পারো, নারিকেলপাতা স্ত্রী নাকি পুরুষ? স্ত্রী লোকের চক্ষেই অধিক জল আসিয়া পড়ে কি না! সন্ধ্যায় ছাদে কাপড় তুলিবার সময় সন্ধ্যাতারা উঠিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিলে অল্প হিমভাব হয় বাতাসে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র সাদা নীল মেঘের সহিত কুমীরডাঙা খেলে দিনভর। শরত আসিয়াছে। শিউলিতলা সাদা হইয়া আছে ভিতর উঠানে। নদীর চরে কাশ ফুটিয়াছে বুঝি! কী এক মারণরোগে নাকি সমস্ত পৃথিবী ঘরবন্দী গত ছয়মাস যাবত। আমি বড় হাসিয়া লই এইসব শুনিয়া। আমার মত গৃহস্থবাড়ির ছাপোষা মেয়েমানুষের আবার অন্তরীন শব্দখানি নতুন ঠেকিবে কেন? কোনও কিছুই নতুন ঠেকে না সই। না এই গৃহবন্দী দশা, না এই নিভৃতবাস। এমনকি আজকাল যে নতুন একখানি নিয়ম করিয়াছেন সরকারবাহাদুর যে একটুকরো বস্ত্রখন্ড লইয়া মুখখানি বান্ধিয়া রাখিতে হইবে, মাথাও ঢাকিয়া রাখিতে হইবে—তাহাতেও মনে মনে ভারী আমোদ হয়! কত কত বৎসর মেয়েমানুষের মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া, মুখে চাপা দিয়া রাখিয়াছে সই ইহারা, কখনো কাপড়ের টুকরায়, কখনো বা ভয় দেখাইয়া, লজ্জার দোহাই পাড়িয়া অথবা শাসন করিয়া তাহারি প্রতিশোধ লইতেছেন প্রকৃতি মা স্বয়ং। তুমি হাসিতেছ হয়ত এতখানি পাঠ করিয়াই, কারন তোমার পিতৃগৃহে বা শ্বশ্রুগৃহে তুমি এমত বিধিব্যবস্থার সহিত তেমন পরিচিত নও। তথাপি আমরা যাহারা তোমার আবাল্য সখির দল, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই এই মুখ বান্ধিবার খেলার ফাঁদে বন্দিনী সই। তবে ওই যে গুন গুন করিতাম কলিখানি—হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে! সেই বাঁধা না পড়া পরাণপাখিটাই বড্ডো যাতনায় ছটফট করিয়া ডানা ঝাপটাইতে থাকে অষ্টপ্রহর বক্ষের আঁধারে নিত্যদিন।

আমার মত "সৌভাগ্য" লইয়া যাহারা, বিদ্যালয় শিক্ষা অতিক্রমের ক্ষণেই অলুক্ষুণে রূপের সহিত নিম্নবিত্ত, পরগৃহে আশ্রিত বাপমায়ের দায়মোচনের বাধ্যতায়--সুউপায়ী বিত্তশালী পাত্রের কণ্ঠমালা হইয়া শোভা পাইতেছি তাহারা জানি, বড়োঘরের বধূরূপে আমি সেই লগ্নেই বরণমালা পরিয়াছি পরাধীনতার। তফাত এইটুকুই যে আমার খাঁচার চন্দনার শিকলখানি লৌহের আর আমার তাহা স্বর্ণ ও মানিক্যশোভিত। নিঃসন্তান বন্ধ্যা নারী হওয়া সত্ত্বেও আমি মানবজন্মখানি লইয়া যে বিব্রত ও অপরিপূর্ণতায় আক্রান্ত হই নাই, তাহা লইয়া আমার আত্মীয়কুটুম্বদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নাই। কালীমাতার একনিষ্ঠ সেবিকা আমার খুড়শাশুড়ির মুখনিঃসৃত "বাঁজা মেয়েছেলে" সম্বোধন শুনিয়া শুনিয়া ভাবি আচ্ছা, মহাকালী কি কখনো গর্ভধারন করিয়াছিলেন? এইসব অন্যায় চিন্তায় আমার মহাপাপ হইবে, তাই না সই? নরকবাসও হইতে পারে জানি। কিন্তু পাপপুণ্যই যদি বিচার করিতাম, তবে আর দুমুঠো অন্নের নিমিত্ত মুখমন্ডলে কাপড় বাঁধিয়া এবাড়িতে এতগুলা বৎসর পড়িয়া রহিলাম কেন? না না, করোনাঠাকুরানীর তাড়নায় কাপড়ের বন্দোবস্তের আলাপ করিতেছি না। অদৃশ্য সেই মুখাবরণীর কথাটুকুই লিখিতেছি গো যাহা জন্মইস্তক নিজ মুখেও বাঁধিয়া রাখিয়াছি অন্য মেয়েমানুষকেও বাঁধিতে দেখেতেছি। নবমবর্ষীয়া বালিকাটিকে যেদিন পেয়ারার লোভ দেখাইয়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করিয়া তাড়না করিয়াছিল তাহারই আপন পিতার অগ্রজ, এবং তাহা জানিয়া সেই ক্রন্দনরতা বালিকার মুখ, মাতা প্রাণপণ চাপিয়া ধরিয়া কথাটি গোপন করিতে বলিয়াছিলেন সেই কত বৎসর পূর্বে, সেইদিন হইতেই শিখিয়াছি মেয়েমানুষকে মুখ বাঁধিয়া রাখিতে হয়! যন্ত্রনা ও অভিমানে ছটফট করিতে করিতে সেই রাত্রির অন্ধকার আমি বিস্মৃত হই নাই সই। প্রলম্বিত বারান্দার আবছায়ায় প্রবল প্রতাপশালী আশ্রয়দাতা পুরুষটির পদতলে বসিয়া আমার মাতার কাতর ক্রন্দন ও অনুনয়---"আমি তো সহ্য করিই বটঠাকুর, আমার কন্যাটিকে রেহাই দিন..."! পঙ্গু অশক্ত কর্মহীন ভ্রাতার সপরিবার ভরনপোষনের মূল্য দেহের বিনিময়ে শোধ করিয়া সেই নারীটি তো কেবল মুখমন্ডলেই নয় অন্তরাত্মায় চিরকালের জন্য বাঁধন পড়িয়াছিল আমৃত্যু। আমিও তাহা বহন করিতেছি প্রতিবাদহীন! আর দেখিয়া আসিতেছি অজস্র মুখোশের আড়ালে বাঁধিয়া রাখা, দমবন্ধ করিয়া রাখা মুখ ও মন। এই যেমন আমাদের গৃহের

গদ্য অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

পার্শ্বেই যে নতুন অট্টালিকাখানি হইয়াছে তাহাতে অনেকগুলি পরিবারের বসবাস। 'আনন্দনিকেতন'' নামক বহুতলের বাসিন্দাদের উচ্চস্বর কথোপকথন ভাসিয়া আসে মধ্যরাত্রের অন্ধকার ভেদ করিয়া কখনো কখনো। যে ব্যক্তিত্বময়ী তরুনীটিকে বারান্দার লতাগুল্মের আড়াল হইতে প্রত্যহ, বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকুরীতে বাহির হইতে দেখিয়া সকাল দশটায় বুকের গভীরে কোথাও শ্বাস লুকাইতাম আর উহার জন্য প্রার্থণার সহিত পরজন্মে অমন একখানি রেশমের শাড়ি পরিয়া আপন দ্বিচক্রযান লইয়া গর্বিত চিত্তে মাথা উঁচু করিয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখিতাম, উহার চাপা কান্নার শব্দে রাতের অনিদ্রার মুহূর্ত আলোড়িত হইতেছে কিছুকাল। জানিলাম উহার পতিদেবটি সুভদ্র পোশাক ও মার্জিত আচরণের আড়ালে এক কোটি টাকা ঋণ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। অন্য সংসার, জুয়া ও নানাবিধ শৌখিনতার দায়ভার স্ত্রীর স্কন্ধে প্রত্যর্পণ করিয়া। দিদিমনির মুখে বান্ধিয়া রাখা বস্ত্রখানি এই করোনাব্যাধি অতিক্রান্ত হইলেও সরিবে না, ইহা বিলক্ষণ জানি। উহার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার নিকট পিতার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিতে আজীবন মুখ বান্ধিয়াই চলিবেন মাতা। সমাজ নামক জগদ্দল প্রস্তরখন্ডের ভার বড়ই দূর্বিষহ যে সই! তদুপরি 'মানাইয়া লইবার' কী এক বটিকা জন্মলগ্নে সেবন করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাবত নারীদের সেই পুরাকাল হইতে! উহার স্বাধীনতা আর আমার পরাধীনতা কোথা যাইয়া যে একত্রে ওই বস্ত্রখন্ডে মুখ লুকাইয়াছে তাহার খবর কে লইবে! ইতিমধ্যে আমার গৃহসহায়িকা কন্যাগুলি নবাগত এই ব্যাধির প্রকোপে কয়েকমাস বিরতিতে থাকিয়া কাঁদিয়া আসিয়া ধরিয়াছিল পুনরায় কর্মেনিযুক্তির। আমার বিস্ময়ের অবধি নাই তাহা শুনিয়া! ইহা কী প্রকার দিন আসিল! বিনা পরিশ্রমে গৃহে বসিয়া মাহিনা লইতে আপত্তির কারণ অনুসন্ধানে আবিষ্কার করিয়াছি তীব্র প্রহার ও শারীরিক অন্যান্য কামনাতাড়িত অত্যাচারের চিহ্নসকল যাহা তাহাদের বীরপুঙ্গব কর্মহীন স্বামীগন আপন অধিকারবলেই প্রয়োগ করিয়াছে নিত্যদিন। গৃহবন্দী বিনোদনহীন কর্মহীন জীবনের যাবতীয় হতাশা আক্ষেপ ক্রোধ প্রশমন করিবার একমাত্র পথ বোধহয় নারীশরীরের ভিতর দিয়াই যুগ যুগ ধরিয়া নির্ধারিত। উহাদের রক্তাক্ত ঠোঁট কাপড়ের খন্ডের আড়ালে দিব্যি চাপা পড়িয়া আমার আত্মাকে চক্ষুপীড়া মুক্ত করিতেছে অন্তত যা হোক। বহু নারী গৃহহিংসা লুকাইবার এমন একখানি অজুহাত পাইয়া কর্মক্ষেত্রে কৌতুহল ও ঔৎসুক্য হইতে মুক্তি পাইল বোধ হয় সই! বরং অনভ্যাসের মুখোশে পুরুষ সমাজের হাঁসফাঁস দমবন্ধ অবস্থাখানি আমার চক্ষে বড়ই উপভোগ্য ঠেকে এই ব্যধিজর্জর পৃথিবীতে।

তুমি গৃহে আসিবে বলিয়া ঝাড়পোঁছ ও সাজসজ্জা হইতেছে পিত্রালয়ে তোমার। আদর্শ নারী বটে তুমি সই। এত অসীম প্রতিপত্তি ও প্রতিপালনের দায়িত্ব সামলাইয়া এমন জগত সংসারের যাবতীয় দুষ্টের দমন করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াও চতু:সন্তানের ভরনপোষনের যাবতীয় দায়ভার তোমার স্কন্ধেই যে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাই তো সামাজিকভাবে তৃপ্তিকর ও আদর্শ হইবার যোগ্য! এসব শক্ত কথা আমি বলিতেছি বলিয়া অবাক হইতেছ বুঝিতেছি। না গো সই। এই কথাগুলো আমি লিখিতেছি বটে, কিন্তু সেদিন বলিতেছিল আমার গানের দিদিমনি, অদিতি। প্রথম বিবাহ ভাঙিয়া যাইবার পর সে যে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অত্যন্ত সুখি হইয়া সংসার করিতেছে এ বিষয়টি অদ্যাবধি এই গৃহে অজ্ঞাত বলিয়াই তাঁহার যাতায়াত অনায়াস আপাতত। তাঁহার স্বামীটির উদারমনস্কতার কাহিনী শুনিয়া ভরসা পাই পুরুষসমাজের হৃদয়বৃত্তি ও বিবেক বস্তুগুলির অস্তিত্বের উপর। আমার এই ক্ষুদ্র জগতে উদাহরণযোগ্য এমন মনুষ্যের যে বড়ই অভাব, তাহার জন্য দায়ী তো কেবল আমিই নই সই। না দেখিলাম বৃহৎ জগত, না জানিলাম বৃহৎ মনের পুরুষসমাজের কথা। এই কয়েকমাসের ব্যাধিজনিত বিধিনিষেধ আপাতত আমার একমাত্র আনন্দের দুয়ারখানি বন্ধ করিয়া দিয়াছে, যাহার নাম অদিতি। তাহার বড় জা'য়ের কথা শুনিয়াছি। অজস্র উচ্চশিক্ষার বিদ্যে ডিগ্রী অর্জন করা সেই মেয়ে স্বামীর উচ্চচাকরীর পদতলে সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া বারংবার বিদেশ গমনের সৌভাগ্যটুকু জনসমক্ষে সগর্বে প্রকাশ করিয়া সন্তান ও সংসার সামলাইয়া পতি পুত্রের গরবে গরবিনী। তাহার কাহিনী অবিকল এই অর্ধশিক্ষিত আমারি মত, কেবল মোড়কখানি কিছুটা পৃথক। মুখের অদৃশ্য বন্ধনের তলায় তাহারও চাপা পড়িয়া আছে পরান্নভোজনের গ্লানি ও স্বীকৃতিহীন গৃহকর্মের ক্লান্তিময় হাসি। ও হ্যাঁ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গাত্র লইয়া তাহার এরূপ পতিভাগ্য বহুজনের চর্চার বিষয়। মা কালিকা অপেক্ষা রূপবতী নারী পৃথিবী দেখিয়াছে কি না আমি জানি না, কিন্তু এমন রূপবতী মেয়েমানুষ যে দেখিতেও চাহে না সহ্য করিতেও পারে না এই দুনিয়া, ইহা বিলক্ষণ জানি। এইসব অপ্রাসঙ্গিক কথা আজ থাকুক, তোমার আগমনের প্রস্তুতিতে কয়েকদিন আমিও পিত্রালয়ে যাইবার অবসর পাইলে কী মজাই না হইত! এই সংক্রামক ব্যাধিটি কবে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইবে তাহা বড়ই অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় আমি এই গৃহে তাহা বহন করিয়া আনিয়া সংসারের অমংগলের উপলক্ষ হইতে পারিব না। তোমার সহিত একটিবার দেখা হইবে কী প্রকারে তবে বলো? জানি না সামনের বৎসর অথবা আর কখনোই দেখা হয় কি না হয়! বলিতেছি বটে পিত্রালয়, আমার তো প্রকৃতপক্ষে পিত্রালয় নেই সই। পিতামাতা গত হইয়া মুক্তি পাইয়াছেন। ভ্রাতাটি মেধাবী হওয়ার সুবাদে বহু পরিশ্রম করিয়া আপন অন্নসংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে দূর প্রবাসে। তবু শুধুমাত্র তুমি আসিবার সময়টুকু বড়ো

গদ্য অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

আনমনা হইয়া পড়ি প্রতি বৎসর। বুকের গভীরে যেন ঢাকে কাঠি পড়িতে থাকে। ধুনোর সুগন্ধে আবছায়া চিরদুখিনী মায়ের মুখখানা অশ্রুজলে ঝাপসা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি নিত্যদিন স্নানান্তে। বড়ো ইচ্ছে হয় সিদ্ধভাত মাখিয়া মা কে খাওয়াইয়া দিই নিজ হস্তে। সমস্ত জীবন ইহার অধিক কিছু প্রাপ্য হয় নাই বলিয়া মা আমার ওই সিদ্ধভাতটুকুই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বলিয়া ঘোষনা করিয়াছে চিরকাল। পিত্রালয় নেই আমার, কোনও আলয়ই কি ছিল কখনো এ পৃথিবীতে? তবু টবের গাছ যেমন ভূমির গভীরতা বিস্মৃত হইয়া ওই সামান্য পরিসরে নিজেকে সাজাইয়া গুছাইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আরো অন্যান্য সইদের মত আমিও তেমন ভালো আছি সই---বরাদ্দ মৃত্তিকাটুকু নির্ধারিত হলেও রৌদ্র এবং হাওয়া তো অনন্ত! আমি ভালো আছি সই। অভাব নামক বস্তুটির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বিবাহের পর। স্বামী আমার ঈষৎ বদমেজাজি হইলেও অমানুষ নহে, আর পুরুষমানুষ সামান্য তেজিয়ান না হইলে সমাজে মান থাকিবে কী প্রকারে? অবশ্য মেয়েমানুষের কথা পৃথক, অধিক তেজ তাহাকে অহেতুক মুখরা করিয়া সংসারে অশান্তি আমদানি করিয়া থাকে মাত্র, এমনটিই জানিয়াছি। তোমার এই উমা বেশখানিই যেমন পছন্দের সকলের! কেমন ছেলেপুলে লইয়া ভরভরন্ত গিন্নিমা, আহ্লাদী কন্যাটি। এই তুমিই যে ডাকাত দলের সম্মুখে অস্ত্র হস্তে দাঁড়াইয়া তাহাকে পদতলে ফেলিয়া বক্ষে পা রাখিয়া এলোচুলে দাঁড়াইতে পারো---তাহা ভাবিয়া রোমাঞ্চিত হই। ঘরে ঘরে সেই কাহিনী আমাদিগের নারীপুরুষ নির্বিশেষে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অথচ সই আমরা যাহারা তোমার সখির অংশ, তাহারা এইরূপ উপেক্ষিত ও অশ্রুসিক্ত দিন অতিবাহিত করিতেছি কী কারনে! খবর পাইলাম, তোমার সুসজ্জিত পিতৃগৃহের পার্শ্বেই রেললাইনের ধারে মাঝবয়সী ভিখারিনী মা ও তাহার শিশু কন্যাটিকে কাহারা মধ্যরাত্রে হাত পা বাঁধিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। অভাগী শিশুকন্যাটি মরিয়া বাঁচিয়াছে, মাতাটি লড়াই করিতেছে মুক্তির অপেক্ষায়। এই ভয়ানক ব্যাধির প্রকোপও অন্তরায় হয় নাই মনুষ্যের লালসার পথে! যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের অবশ্য মুখ বাঁধা ছিল, যেরকম সমস্ত পাপ ও গোপনীয়তার মুখ ঢাকিয়া রাখিবার নিয়ম অজস্র বৎসর ধরিয়া। কী অপূর্ব পরিহাস! প্রসঙ্গত বলি, গত তিন মাস যাবত আমার ঋতুবন্ধ থাকিবার নিমিত্ত গৃহে আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল হয়ত এবার বন্ধ্যা মেয়েমানুষটি ফলদানে সক্ষম হইতে চলিল। দু সপ্তাহ পূর্বে নানাবিধ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে গর্ভে সন্তান নয়, একখন্ড মাংসপিন্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার লক্ষ্মণসমূহ মারণরোগের। বন্ধ্যা মেয়েছেলের নিমিত্ত অর্থব্যয় করিয়া অধিক চিকিৎসা করিবার মূর্খামি কেহ করিবে না এমত ঘোষণা এবং এ পরিবারে অদূর ভবিষ্যতে একটি ফলদায়িনী সক্ষম নারীর আগমন সম্ভাবনার পুলক উপলব্ধি করিবার পর এই শরতে দূরে কোথাও মুক্তির বাঁশি বাজিয়া উঠিতেছে শুনিতে পাইতেছি সই। তাইই এ পত্র তোমার জন্য লিখিয়া রাখিলাম। আমার মত হতভাগিনীরা পরজন্ম নামক কল্পিত স্বর্গের প্রত্যাশায় মরিতে ভয় পায় না, তুমি নিশ্চয় অবগত আছো। তাহার পূর্বে আমায় একবার তোমার যে কোনও একটি অস্ত্র ধার দিতে পারো সই, একবারের জন্য?

আজ বড়ো অস্থির হইয়া ইচ্ছে করিতেছে মুখের এই বস্ত্রখন্ডখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মাঝরাস্তায় খোলাচুলে দাঁড়াইয়া সমস্ত আসুরিক শক্তির বক্ষে পা রাখিয়া চিৎকার করিয়া উচ্চারণ করি গোপন লজ্জার কণ্ঠরোধ করা ইতিহাস---কেননা এসকল লজ্জা তো সমাজের লজ্জা, কোনো আচ্ছাদনই যাহা আবৃত করিতে পারে না! তোমার ত্রিশূলখানি একবার হস্তে তুলিবার অধিকার দেবে সই?

নাহ, কিছুই করিবার সাধ্য আমার নাই। তাই তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম আমার, আমাদের গ্লানি যন্ত্রনা অপমান আর কষ্টের টুকরো কথাগুলো। তুমি তো শক্তিস্বরূপিনী। আমাকে তোমার স্মৃতিতে রাখিবার কোনও কারন নাই, তাই এই পত্র পড়িয়া সামান্য বিচলিত হইলেও নিশ্চিন্তে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে জানি। বিদায়কালে নদীর জলে একবার নিজ মুখখানি দেখিলে হয়ত মনে পড়িয়া যাইতেও পারে এই বাল্যসখির কথা। নিমজ্জিত চালচিত্রের ভিতর অসংখ্য সখিদের কথা! এসো উমা, ঘরে এসো। ওই যে মঙ্গলশঙখ প্রস্তুত তোমার আবাহনের!

প্রীতি নিও।

ইতি
তোমার ভুলে যাওয়া সই শালুকফুল!

****

গদ্য

দুর্গা হাসে, দুগ্গা কাঁদে

~ সুব্রত সাহা

মাতৃগর্ভেষু...

কখনো জানতে চাইনি কেমন আছো? ঠিকমতো তো হাঁটতেও পারো না। কখনও কোন কাজে সাহায্যও তো করিনা। আচ্ছা মা, তোমাদের বিবাহ বার্ষিকী কবে? কোনদিনও জানতে চাইনি। জন্মেছিলাম চা বাগানের হাসপাতালে। এতটাই ছোট্ট ছিলাম যে অনেকে বলেছিল বাঁচবোনা হয়ত। তুমি, মা তুমি আমায় আগলে রাখতে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত কত জ্বালিয়েছি তোমায়। কত দিন নির্ঘুম কাটিয়েছো তার তা কোন হিসেব নেই।
আমার দুর্গা শুধু গর্ভধারীনি নয়। সেতো লোহিতপ্রভা। জীবনদায়িনী। মাতৃভাষা শেখার প্রথম শব্দ "মা"। সে আমারই দুর্গা। বন্দেমাতরম। দেশকে কতোটা ভালোবাসি জানিনা তবে তুমি ছাড়া আমি অচল একথা বলতে পারি নির্দিধায়। তুমি, আমার কাছে আস্ত দেশ মাগো। তুমি দশ নয়, দুহাতে আগলেছো সংসার। সহ্য করেছো কতনা ঝড়। খড়কুটো হয়ে থেকেছো জীবনভোর। নিজের জন্য তো কোনদিনই কিছু চাইতে দেখলামনা...

আমরা মা আমার দুর্গা। সে পেট ব্যথায় পান আর সরষের তেল মাখিয়ে পেটে বুলিয়ে দেয়। তারপর সেটা পুড়তে থাকে পট পট পটপটপট। কখনো ঘরে পান নাথাকলে গামছা ভিজিয়ে সারাটারাত জেগে বসে থাকে। বমিগুলো নিজে হাতে পরিস্কার করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় পরম আদরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

সে নিতান্তই সাধারণ যে তাঁর কোন গল্প নেই। কথায় কথায় তার সাথে ঝগড়া না করলে আমার পেটের ভাত হজম হয়না। সন্ধ্যায় এক কাপ চা না পেলে জীবনটা বিস্বাদ মনে হয়। তেমনি সে যখন অসুস্থ হলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তখন খড়খরে হাতের পরশে বুঝি এটা আমার দুর্গার হাত। ক্যালসিয়ামের অভাব। ভাঙা পা নিয়ে টেনে টেনে হাঁটে।

বিশ্বাস করুন, সামান্য ওষুধটুকুও কিনে দিতে পারিনা। ভালো ভালো খাবার ডাক্তার বদ্যি অধরা। শঙ্করী নাম বদলে শ্বশুরবাড়ির দেয়া নাম কণিকা। সে যে নামই হোক আমার দুর্গা আমার মমতাময়ী মা। মাঝেমধ্যে পুরোনো কথা মনে পড়লে লুকিয়ে কাঁদে। অসহনীয় ব্যথা সহ্য করে আমাদের জন্য সব কাজ করে হাসিমুখে। সহজ দুর্গা মা আমার...

কন্যাশ্রী সর্বভূতেষু...

....

"ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপে নমঃ সংস্থিতা"। যেদিন প্রথম দেখেছিলাম মুখ চাওয়াচাউয়ি করে বুঝে নিতে চাইছিলাম কে কোনটা! দূরভাষে কথা বলার সময় গুলিয়ে ফেলি কার সাথে কথা বলছি। পাঁচ মিনিটের ছোটবড়। যমজ। সজ্ঘা আর প্রজ্ঞা। কি এমন করেছে যে আজ ওদের নিয়ে লিখছি। আসলে খুব খুউব সাধারণ কয়েকজনের কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।
খাপসাডাঙ্গা, চেপানী, শামুকতলা, কোহিনুর, তুরতুরি রাজ্যের সব জায়গায় এরকম হাজারো কন্যারা আছে। প্রত্যন্ত কুঁড়ে ঘর থেকে উঠে আসা ওরাই আমার আজকের অনন্যা। আজকে তারা আমার দুর্গা।

দু বোন কন্যাশ্রী প্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা করে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বাবার হারানো জমি ফিরিয়ে দিয়েছে। সংসারের হাল ধরতে কলেজে পড়ার পাশাপাশি ক্ষুদে শিশুদের পড়িয়ে যতটা পারে আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
বাড়িতে ওরা দুই বোন মা বাবা নিয়ে টানাটানির সংসারে ভাই না থাকার আক্ষেপ নেই। প্রজ্ঞা বলে ওঠে, সেই তাদের ছেলে। পড়ানোর পাশাপাশি জমিতে ভূট্টা গাছ, ধান লাগায়। পরিচর্যা করে। আবার কেটে এনে রাখে।

ভাঙা ঘরে জল পড়ে। বিশ্বাস করুন, আজকের দিনেও মাটির মেঝে, পাটকাঠি আর চাটাই এর বেড়ায় ওদের লজ্জা নিবারণের মতো ওদের ঘরবাড়ি। আমার মতে অবশ্য ভালো বাসা। আলিপরদুয়ার জেলার ২ নং ব্লকের ওরা গর্বিত কন্যাশ্রী। দুই বোন "কন্যাশ্রী" নাটকে অংশ নিয়ে যেমন সুনাম কুড়িয়েছে তেমনি রুখে দিয়েছে কয়েকটি বাল্যবিবাহও। তাই আমার চোখে ওরা অনন্যা। আমার দুর্গা।

****

গদ্য

এস সমারোহে

~ মহুয়া চৌধুরী

আমাদের ছোটবেলার পুজোর দিন গুলো একটা নিজস্ব গন্ধ ছিল। তা শুধু নতুন জামা কাপড়ের নয় আরো কিছু ছিল মোহ। একমাস স্কুল ছুটি মানে সত্যিই ছুটি। এখনকার মত ছুটি হলেও পড়াশুনো আমাদের সময় ছিল না। বাড়িতে নারকেল আর গুড়ের গন্ধ মম মম করত চারপাশ।

পুজোর দিন গুলো তে সেই ছোটবেলার অবুঝ স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে মন খুব চায়। কিছু না করার একটা স্বাধীনতা আছে। সেটা উপলব্ধির সবচেয়ে ভালো সময় দেবীপক্ষ। এই মজাটা অনেক দিন থাকে।আসল কথা টানে অনেকদিন কোনো বাধা ধরা অভ্যাসের মধ্যে না থাকার একটা উপলব্ধি আছে।

চলতি সিস্টেমে আঘাত সত্যিই কি মানবী দুর্গার সব চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াতে।দেশ থেকে সতীদাহ হয়তো চলে গেছে সেটা অন্য রূপে ফিরে এসেছে এই সময় দাঁড়িয়ে নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন সবচেয়ে আকর্ষণীয়, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা কে যে সামাজিক পরনির্ভরতা প্লান করতে পারে সেই তো সমাজ ও সংসারে সুখ শান্তি বজায় রাখতে পারে।

রমণী আজও পুরুষের কাছে ভোগের সামগ্রী কিন্তু তাকে আর অন্তঃপুরে বন্দি করে রাখা সম্ভব নয় সে এখন ঘরে বাইরে সমানতালে হাঁটতে শিখেছে ছেলেভোলানো গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে তবে বেশ হয়। অথবা যদি জয় গোস্বামী আওড়াতে পারে তবে বেশি ভালো হয়। টেলিভিশনের পর্দায় নারীর যে সুন্দর দেহ আমরা দেখি আর ভাবি কত আনন্দ কিন্তু সেটা ও বিকিকিনির মস্ত হাট।ভারতবর্ষে মেয়েদের একটা উঁচু আসনে বসিয়ে খুব সম্মানের সাথে অনেক কিছু কেড়ে নেওয়া হয়। আর তাকে বোঝানো হয় তুমি এই আসনে বসার যোগ্য হয়ে ওঠো। সত্যি কথা বলতে কি স্বাধীনতার কোনো অর্থই তারা বোঝে না। আমি অনেক শিক্ষিত নারী কে বলতে শুনেছি,"আমার স্বামী আমাকে প্রচুর স্বাধীনতা দেয়"। আরে স্বাধীনতা কি দেওয়ার জিনিস সে তো তার জন্মগত অধিকার। বোকা মেয়েগুলো তাই নিয়ে কি খুশি না হয়।যতই অসুবিধা হোক যতই কষ্ট হোক দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে মানবী দুর্গা এই পরাধীন জীবনে। বাংলা একটা বৃহৎ সংবাদপত্রের পাত্রী চাই কলম দেখলে বোঝা যায় কতটা শোপিস বানিয়ে রাখতে চায় সমাজ আজও দুর্গাদের। সত্যি খুব কষ্টকর এই পরিস্থিতি। নারীবাদী সমাজব্যবস্থা চাইনা তবে পুরুষতান্ত্রিক নয়।একটা সমাজব্যবস্থা হোক যেখানে দূর্গা শিব সবাই সমান অধিকারে থাকবে। তুমি যদি রাত দুটোর সময় রাস্তায় নামতে পারো আমিও পারি ।একলিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সম্মান এর সাথে একে অপরের সাথে আরো সুন্দর করে পৃথিবী গড়ে তুলবো। এই হোক দুর্গা উৎসবের মন্ত্র।

কিছুদিন আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমেরিকা যাবার সেখানে দেখেছি মানবীদের জীবন যাপন চিত্র।স্বাধীনতা শব্দের এক নতুন অভিধান আমার চোখের সামনে খুলে গেছে । প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রতিটি মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধা অন্যরূপ দেখেছি। চোখের সামনে ভেঙে গেছে অনেক বদ্ধমূল ভাবনা।আমরাও তো সবাই এই গ্রহেরই মানুষ তাই যা কিছু ভালো আছে তাকে গ্রহণ করতে অসুবিধা। যে পুরোহিত মায়ের পুজো করেন আদ্যা স্তোত্র জব করে জপ করে। তিনি আবার ছেলের বিয়েতে পণ দাবি করেন। আজও এই দরিদ্র দেশে কত দুর্গা বলি হয় তার খবর কজন রাখে।

এই দুর্গা উৎসবের সংকল্প হোক আনন্দময় মানবিক মুখ। মাটির দুর্গা নয় ঘরে ঘরে রক্তে-মাংসে দুর্গাকে আমরা সবাই আরাধনা করি আসুন।

****

অনুগল্প

শাপমোচন

~ সঞ্জয় কুমার নাগ

মাঝেরডাবড়ি। ডুয়ার্সের চা বাগান ঘেরা এক ছোট্ট জনপদ। কিছু অশিক্ষিত সাদামাটা মানুষের বাস। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটো অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ।আর এই মাঝেরডাবড়ির হাজার দেড়েক মানুষের গার্জেন নীরেন হালদার।টু ইন ওয়ান। একদিকে পঞ্চায়েত,অন্যদিকে কোয়াক ডাক্তার। গাঁয়ের সকলের মাথা ডাগদার হালদার।বস্তির ছাওয়াগুলা ইস্কুলে যায়।মিড ডে মিল খায়।অঙ্গনওয়াড়ীর ছাতু খায়। কিন্তু কেউই হেলথ সেন্টারের ডাওয়া মারায় না।মা ও নীরেন হালদারের ভয়েই। গাঁয়ের মানুষের যে কোনো রোগের ওষুধ দেন হালদার।ওর অমৃত বটিকা আর সঞ্জীবনী টনিক-এর উপরই অগাধ ভরসা সকলের। গাঁয়ের হেকিম হালদার ডাগতারই গাঁয়ের মানুষের স্বাস্থ্যের হাল ধরে আছেন।নীরেন হালদার বলেন-তোরা যেখানে খুশি যা। কিন্তু হেলথ দিদিমণি-দের বগলে গেলে হামি আর তোদের লগে লাই।

কিন্তু আইজ বিহান হইতেই অবাক কান্ড!!! তাজ্জব কি বাত্!!! হালদার ডাগদার কিনা দিদিমণি-দের লগে বইসে হ্যালথ স্যান্টারের ডাওয়ায়??!! বাগানের পাতিঅলা--চা লেবার, সককলে ভিড় জমিয়ে দিলো। কারো কামে যাবার নাম লাই?!শরতের শিশির ভেজা সকালে হালদার ঘেমে নেয়ে জবজবে।এই তো সেদিন অজিত নার্জিনারির বেটি দুগগার লেবার পেইন।যন্ত্রণায় মেয়েটা কুঁকড়ে গিয়েছিল।নীরেন ওর ওষুধ দিয়েছিল বটে। কিন্তু ব্যথাটা কিছুতেই কমলো না। অসহায় অজিত বলেছিল--বাবু, দিদিমণি গুলাক ডাকিয়া পুছ করি? শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন হালদার।চিৎকার করে বলেছিলেন--হামার ভিতি ভরসা লেই তোর?? পরে ফুলন দাই এসে প্রসব না করালে বেঘোরে প্রাণ দিতে হতো দুগগাকে।

চারিদিকে পুজো পুজো পরিবেশ। বাতাসে শিউলির গন্ধ। দুদিন বাদে মায়ের বোধন।ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন নীরেন ডাগতার।ভিড়ের মাঝখানে।যতীন লামার কাঁধে হাত দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নীরেন। যতীন............বেটিটা সারাটা রাইত বহুত কাৎরাইছে।বেথাডা তবু কমে লাই।পুরা মাহিনা।বাচ্চাটাও লইড়তেছে লা...............।

হঠাৎ, গুমোট নিস্তব্ধতাকে চিরে শোনা গেল বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। ততক্ষণে শরতের নরম সোনালী রোদ এসে পড়েছে হেলথ সেন্টারের বারান্দায়।

****

অনুগল্প

দুগ্‌গার ইচ্ছেপূরণ

~ তৃণা কানুনগো

বৃষ্টির বয়স তখন বছর আট; দাদু ভাই হরিদ্বার থেকে বাড়ির সবার জন্যই শিব লিঙ্গ নিয়ে এসেছে, তাই নিয়ে বাড়িতে বিশাল হৈচৈ চলছিল । মেঘা বৃষ্টি কে ডেকে বলল, "বৃষ্টি , দুধ টা খেয়ে যা তাড়াতাড়ি" মায়ের ডাক এ এক ছুটে রান্নাঘর এ চলে গেল বৃষ্টি। দুধের গ্লাস টা হাত এ নিয়ে খানিক অবাক হল বৃষ্টি। তার মনে হল, মায়ের চোখে কি যেন একটা ছলছল করে উঠল ! "ও মা, তুমি কাঁদছ ? মা, কি হয়েছে মা, বলবে না আমায়?" মেঘা আচমকা মেয়ের প্রশ্নে থমকে গেল। এর আগে তো কেউ তার চোখ এর জল নিয়ে প্রশ্ন করেনি কোনদিন। মেঘা যে কন্যা সন্তান এর জননী।

মেয়ের কপাল এ আলতো করে হাত বুলিয়ে মেঘা বলল, "কই মা, কিছু না তো"। তাও বৃষ্টি নাছরবান্দা। "মা, দাদু তোমার জন্য শিব ঠাকুর আনেনি কেন?" মেয়ের এই তদন্ত মুলক প্রশ্নে, মেঘা যেন বাক্ রুদ্ধ! বৃষ্টি যেন তার অন্তরের মণিকোঠায় ঢুকে পরেছে। কোনরকমে প্রসঙ্গ টা যেন ধামাচাপা দিতে চাইল। বৃষ্টি মা কে জড়িয়ে ধরে গালে একটা হালকা আদর করে বলল, "মা আমি বড় হই, আমি কাশি যাব, তোমার জন্য শিব ঠাকুর আনতে!" মেয়ের মুখে এই হেন উচ্চ্যাকাঙ্খা শুনে মেঘা খিলখিল করে হেসে উঠল, "ধুর পাগলি মেয়ে, কাশি তো দাদু দিদারা যায়ে, তোর যখন দাঁত পরে যাবে, তখন তুই কাশি যাস।"

দীর্ঘ ১৭ বছর অতিক্রান্ত; বৃষ্টি আজ একটি সরকারি দপ্তর এ নির্বাহী আধিকারিক এর পদে কর্মরতা। কর্ম সূত্রে একবার বৃষ্টি কে বেনারাস যেতে হল । প্রশিক্ষন এর কাজ সেরে বৃষ্টি তার সহকর্মী দের সাথে কাশি শহর টা পরিভ্রমন এ বেরুল। কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালায় এর দর্শন টা অত্যন্ত মনরম লাগল বৃষ্টির। শিক্ষা জগত এর পীঠ স্থান এ এসে বৃষ্টি মন্ত্রমুগ্ধ।

ফেরার আগের দিন, বিশ্বানাথ মন্দির দর্শন এ বেরুল বৃষ্টি ও তার সহকর্মী রা। রবিবার দুপুর এ অতি চমৎকার প্রাতঃ কালে, গঙ্গা র ধারে, ফুরফুরে সমীরণে , মন্দির চত্বর এ ঘুরতে ঘুরতে একটি দোকান এ একটি তুষার শুভ্র শিব লিঙ্গ দেখল। মায়ের মুখ টা ক্ষণিকের জন্য মনে পরে গেল, সেই ১৭ বছর আগে, মায়ের সেই মেঘ কালো মুখ টা, আজও বৃষ্টি কে ভীষণ কষ্ট দেয় যে! বৃষ্টি মায়ের জন্য শিব লিঙ্গ টা কিনে, মন্দির এ পূজা দিতে ঢুকল। মন্দির এড় পুরোহিত তার হাত থেকে শিব লিঙ্গ টি নিয়ে শোধন করিয়ে দেন। "এটা তোর মা কে দিস, বলিস, বাবা ভোলানাথ সব শাস্ত্রের ওপর এ। বাবা তোর ঘর এই বিরাজ করবে"

কাজ সেরে কোলকাতা ফিরল বৃষ্টি; কাশি থেকে সবার জন্যই কিছু না কিছু আনল। মেঘা আজ মেয়ের পছন্দের আলু পোস্ত আর ধনেপাতা বাটা রাঁধছিল। রান্নাঘর এ ঢুকে বৃষ্টি মা কে পেছন থেকে জরিয়ে ধরে খুব আদর করতে লাগলো। মেয়ের উষ্ণ ছোঁওয়া তে আপ্লুত মেঘা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বৃষ্টি মায়ের হাতে একটা কাগজ এর থলি দিলো। মেঘা খানিক টা অবাক হল, "এটা কী রে?" থলি টা খুলতেই মেঘা র মুখ থেকে কতো বছর এর সেই জমে থাকা মেঘ সরে গেলো। বৃষ্টি চেঁচিয়ে উঠলো, "মা, তুমি কাঁদছ? পছন্দ হয় নি এটা?" ধবধবে সাদা শিব লিঙ্গ টি দেখে ,মেঘা যেন কতক টা হিমায়িত হয়ে গেল। আজ দেবী বোধন। বাপের বাড়ী তে আসা মাত্রই মৃণ্ময়ী দুর্গা তো সুহাস্য ও প্রসন্ন হন ই। কিন্তু আজ চিন্ময়ী মা দূজ্ঞা ও কাঁদলেন, তবে আজ বিমর্ষতায় নয়, নিছক জিতে যাওয়ার আনন্দে।

****

মুক্তগদ্য

ভাসান

~ ফড়িং

বাসস্থান গৃহ হয়ে ওঠে ক্রমশ। আলোবোধ, স্নায়ুবোধ ছেড়ে দৃষ্টির দৃষ্টতা জুড়ে ক্ষয় হয় জন্মবোধ। রক্তাক্ত গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে কত শত নদী। নদীর ভেতর জলজ গাছ ও শীতল পাথর। পাথরের দৃঢ়তা ভেঙে মাটির স্বাদ নিতে গিয়ে খসে পড়ে জিভের স্বাদকোরক। জলজ টান ছেড়ে ওঠার পর সমস্ত শরীর জুড়ে নেমে আসে একক, দশক, শতক, হাজার,অযুত, লক্ষ। সমস্ত যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ সেরে ক্লান্ত হয় জরায়ু। মাছেরা ভক্ষণ শেষে সাঁতারের আনন্দ নিতে নিতে ঢুকে পড়ে যে যার মতো। ঢোকার পথ জুড়ে গজিয়ে ওঠে আরও অনেক স্বাদ। সেখানে পাথর ভেঙে ফেলা হয় একের পর এক। চিৎকার আসে। চিৎকারে নেমে আসে মানবজন্ম। আকার নিংড়ে নিয়ে নদীর বাঁধ তৈরী হয়। প্রত্যেকটা বাঁধের পাশে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে জনবসতি। কথা ও বার্তালাপের পর আবারও বসতিতে গড়ে ওঠে বাসস্থান, বাসস্থান থেকে গৃহ। শুরু হয় গৃহ কথা, জন্মকথা। শ্বাসের নাম রাখা হয় নারীত্ব। প্রত্যেকটা শ্বাস প্রত্যেকটা শূন্যতায় দৃঢ় হতে হতে ছাড়িয়ে যায় মাথা, গলা, বুক, পেট। হাতে ও পায়ে জড়িয়ে ধরে গুল্ম। গৃহ জুড়ে গুল্ম গজায়। শ্বাস বেড়ে ওঠে। কখনো ফুলের ছায়ায় আবার কখনো দেওয়াল জুড়ে জন্ম নেয় অবাধ্য শ্যাওলা। তবুও আরও ফুল ফোঁটে। হাসি ফোঁটে। সমস্ত আশ্রয়বোধ ও ছায়াটুকু নিয়ে ক্রমশ দীর্ঘ হয় বৃক্ষপট। চার প্রকোষ্ঠ সংকুচিত, প্রসারিত হতে হতে নিশ্বাস ফুরিয়ে আসে অভ্যাস ধরে। প্রতিটি নদীতে স্রোত প্লাবিত হয়। প্লাবিত হয় "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"। এভাবেই নদী সাগরে মেশে। তারপর তার নাম হয় নারী, সতী অথবা নারীকথা।

******

আগমনী আছে

~ যাজ্ঞসেনী

এখন শরতের শিউলি ফুলের গন্ধের সঙ্গে মনখারাপ জড়িয়ে থাকে। মাথার ওপর ওই যে ঘন নীলাকাশ, যেখানে রূপকথার মতো খেলা করে সাদা মেঘের দল, সেখান থেকে মা দুগগা আসেন। ওই আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখে ঘুড়িতে লেখা একটা চিঠি পাঠাতে চেয়েছিলাম তার কাছে। আমার চিলেকোঠা ঘর, সুতো, লাটাই, আশ্বিনের স্বাদমাখা লুকিয়ে রাখা প্রথম নিবেদন, দুরুদুরু অনুভূতি, কাজলে আঁকা আনত চাউনি -- এ সমস্ত ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম দুগগার সঙ্গে। সে চিঠি লেখার আগেই চলে গেল কত কত যে দিন। পেরিয়ে গেলাম কত কত সব রাত। চলে যেতে যেতে কবে যেন নিজেই চলে গেলাম নিজের কাছ থেকে। অন্য কোথাও। সেখানে সুখ আছে, স্বাদ নেই। সম্পদ আছে, সম্পর্ক নেই। আগমনী আছে, আস্বাদ নেই। আমি আছি, আমার নেই। ছোটবেলায় সেই চিঠির কথা জানতে পারলে দুগগা নিশ্চয়ই হাসতেন।
আর এখন?

গোধূলির বিষণ্ণ আলোমাখা দুগগাও বদলে গেছেন। কখনও কখনও তার চোখেও জল আসে বইকি।

দুগগা এখন শুধুই দুর্গা ...

******

নাটক

গুণধর সোরেন ও এক ডাইনির গল্প

~ তমোজিৎ রায়

কাহিনী : ছেলেটা একটা ডাইনি পোষে, (আনন্দ বাজার পত্রিকা, সাদা কাক সিরিস); লেখক: স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দৃশ্য –১

(লোকাল ট্রেনের কামরা, এদিক ওদিক মানুষ রিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ আছে বসে, ঘুরছে হকার, এক অন্ধ মানুষ, সেই নাটকের নায়ক গুনধর, চোখে কালো চশমা -গাইছে কোন এক আলোর গান ,তারপর বলতে থাকে)

গুনধরঃ আপনার সময় খারাপ যাচ্ছে? চাকরী খুঁজছেন , পাচ্ছেন না ? বউয়ের সাথে নিত্যদিন খিটখিট ? প্রেমিকার বিয়ে ঠিক? ছেলে পড়ে কিন্তু রেসাল্ট(হাত নাড়ায়) ...কি করবেন?

শরীর টাও জুতের নাই , বাতের ব্যথা, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা...বাড়ি থেকে বেড়োলেই পেট কামরাচ্ছে ...পায়খানা যাচ্ছেন কিন্তু হচ্ছে না , অম্বল, বুক জ্বালা ...ঢেঁকুর , অক্ষিদা, অনিদ্রা, বুক ধরফর, কান কনকন, মনে সব সময় ভয়... কি করবেন? তাবিজ, কবচ মাদুলি? না না সেই সব কিছুই না ...ভাওতাবাজি কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন ...ডাক্তার দেখান ...পেটের সমস্যা হলে গ্যাস্ট্রো ...বাত হলে অরথো, হার্ট হলে কারডীও আর মন হলে সাইকো ...কাউন্সেলিং...ভাবছেন এতসব ডাক্তার কোথায় পাব? এই বইটা হাতের কাছে রাখুন-'কোলকাতার ডাক্তার''- এখানে কোলোকাতার কোথায় কোথায় কোন ডাক্তার কতদিন বসেন, তার নাম ঠিকানা , ফোন সব পাবেন ...মাত্র দশটাকা...।সেই সাথে আর একটা বই একদম ফ্রি ...'জানার কোণো শেষ নাই' –ছোটোদের বিজ্ঞানের আশ্চর্য একটা বই , আকাশের রঙ নীল কেন? হাঁচি কাশি কেন হয় ? চুল কেন পড়ে , আরশোলা কতদিন বাঁচে এরকম ২০০ট প্রশ্নের উত্তর এই বইতে... দুটো বই মাত্র দশটাকা ... মনে রাখবেন বিজ্ঞান সভ্যতাকে আলো দ্যাখায় , কুসংস্কার দূর করুন, বিজ্ঞান কে ভালো বাসুন...। (কেউ কেউ দ্যাখে, কেউ কেনে একজন ষাটোর্দ্ধ মানুষ ওর হাত ধরে)

স্যার: গুনধর না ?

গুন: কে?

স্যার: কিছু মনে করবেন না , আপনি কি শিমূল বনী তে থাকতেন ? মানে শিমূল বনী হাইস্কুলে আমার একজন ছাত্র ...গুনধর সোরেন ...

গুন: স্যর , মানে বিপুল স্যর ...কতদিন পর ...কেমন আছেন স্যর?

স্যর: আছি, কিন্তু তুই...?

গুন: ইদিকে কোথায় ।? ও বনগা ...মিনু দিদির বাড়ি...কেমন আছে মিনুদিদি? আরবলটু সেই দস্যিটা ...(ওর ভাষায় এখন রাঙ্গা মাটির টান)

স্যর; সবাই ঠিক আছে কিন্তু...

গুনঃ আপনি কি স্যর ইখোনও পড়াচ্ছেন স্যর আমাদের ইস্কু...মানে শিমূল্বনিতে?

স্যরঃ পড়াচ্ছি তবে স্কুলে না, রিটায়ার করেছি , গতমাসে...এখন বাড়িতেই গ্রামের কিছু গরীব ছেলে ...। কিন্তু তুই ...

গুনঃ আপনার বেতটা ইখনো আছে স্যর?

স্যরঃ থাকবে না ? না হলে তোদের মত বানরদের মানুষ ...।কিন্তু তোর এমন হল কি করে ? কোথায় থাকিস তুই? এতদিন কোথায় ছিলি?

গুনঃ স্যর স্যর , ইটা কিমন কথা হ'ল বটে? ওরাল পরীক্ষায় ইমনটা হয় নাকি? একসাথে এত্তগুলান কোশ্চেন ?...মাথাটো ঘুইরে যাবেক, লয়?স্যর ও স্যর আমাদের ইস্কুল্টা কিমন আছে স্যর?

স্যরঃ ভালো ...। দুইতলা হয়েছে , চারদিকে দেওয়াল ...

গুনঃ বাঃ , আর সামনের শিমূল গাছটা আছেনা?

স্যরঃ আছে তো ...

গুন; ফাগুন মাসে লালে লাল হয়ে যায় ? আগের মত ?ইস্কুলের মাঠটা ফুলে ফুলে...

স্যরঃ হয় হয় , সব হয় গুণধর , কিন্তু বলত তুই ...তোর চোখদুটো এমন হল কেন?

গুনঃ সে অনেক কথা স্যর ...বলতে বলতে আপনার টিশন চল্যে যাবেক ...

স্যরঃ যায় যাক , আমার সাথে যাবি তুই ...আগে বল কি হল? টেস্ট পরীক্ষায় স্টার পাওয়ার পর , হায়ার সেকেন্ডারির দুমাস আগে গাঁ ছাড়লি ...।তারপর কোণো খবর নেই ...কত খারাপ খারাপ কথা কানে এসেছে গুনধর ...। আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনি ...। কত খোঁজ করেছি তোর , কিন্তু ...

গুনঃ জানি স্যর জানি, একজন শিক্ষক তার ছাত্র কে চেনে, তার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে না , আমার মা বাপ বেচ্যে থাকলে ও করত না স্যর ...

নাটক তমোজিৎ রায়

স্যঃ কিন্তু তুই গাঁ ছাড়লি কেন ?

গুনঃ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান রচনাটা আপনার কাছে শিখেছিলাম তো স্যর ...।মুখস্থ করি লাই , এই বুকের ভিতরটাতে গেইথে লিইছি ...

স্যরঃ কি বলছিস, পাগলের মত?

গুনঃ সত্যি স্যর একদম সত্যি ...। বিজ্ঞান শিকেছি , বিজ্ঞান মানি বুলেই ঘর ছাড়লাম স্যর...।। ছাড়তে হ'ল...

স্যরঃ এসবের মানে কি

গুনঃ চিত্ত যেথা ভয় শূন্য ...উচ্চ যেথা শির ...।জ্ঞান যেথা মুক্ত ...।

(ট্রেনের শব্দে কথা ঢেকে যায়, আমরা ফ্ল্যাশ ব্যাকে যাই)

দৃশ্য–২

(শিমূল বনীর জঙ্গলা জমি ...গুণধরের চোখে এখন চশমা নেই , গায়ে একটা সবুজ সোয়েটার শীত কাল হায়ার সেকেন্ডারির টেস্টের পর , সন্ধ্যা লেগেছে প্রায়, এদিক ওদিক তাকাছে , সাইকেল নিয়ে একটা ছেলে এসে পেছন থেকে ধাক্কা মারে, ওর নাম সুবল)

গুনঃ এই সালা সুবলা, মারবি নাকি রে ...

সুবলঃ একস বার মারব রে সালা... তক্ষন থেকে চক্কর কাটতিছি , সালা আর ইত্তবড় বড় মসা... হাত পা সব ... চল কেনে ঘর চল উ আর আসবেক লাই ...

গুনঃ আর একটু দাড়া না রে ব্যাটা ... মসা গুলান কে আর একটু মোটা হতে দে কেনে ...তুর সরীলে রক্ত একটু বেশি আছে, কমলে ক্ষতি নাই , ঠাকুর বলে নাই ...জীবে প্রেম করে যেই জন...

সুবঃ চুপ সালা , লিজে প্রেম করবে আর আমি মসার প্রতি প্রেম দিখ্যাব ... আহ্লাদ? আমার ডেঙ্গুটা হলে , কে দিখবে সুনি ? তোর সসুর?

গুন;ঃ দেখবে রে দেখবে...আমার সসুর সালা মানুষ ভালো, বিরাট দিল বটে ...।

সুব ঃ সালা... গুন এই গুন সোন কেনে , ই জাগাটা ভালো না ... বেছে বেছে ইখানেই ডাকল কেনে তুকে সোনামনি ?

গুনঃ ডেকেছে বেশ করেছে ? তোর কিরে ? আর জাগা ভালো না মানে কি?

সুবঃ উ গাছটো চিনিস? স্যাওরা বটে ...।

গুনঃ কি ...সালা... সুবলা সাইন্স পড়িস না?

সুঃ হ্যা পড়ি , আমি জানি, ভুত বুল্যে কিছু লাই? কিন্তু ভূত জানে? উ সাইন্স পড়েছ্যে? আচ্ছা তুকে ডেকেছে ডেকেছে , তু আমাকে সাথে আনলি কেনে?

গুনঃ আমরা কথা বুলব ... আর তুই লজর রাখবি... কাউকে দিখলে ...সিগ্নাল দিবি

সুঃ আরে সালা , আমি তুয়াদের সিকিউরিটি ? সালা আমি (সাইকেলে ওঠে)

গুনঃ এ সুবলা সুবলা রে ...রাগ করিস কেনে, বন্ধু বন্ধু'র কথাটো না ভাবলে...

(হঠাৎ একটা বিকট হাসির শব্দ , গাছের ডাল নড়ে ওঠে ...)

সুঃ ওরে বাবারে...(সাইকেল চালিয়ে পালায়)

গুনঃ সুবলা ...সুবলা রে...রুক ...(চলে যায়, আবার হাসির শব্দ,গুনধর নকল করে) এই দেখোগো ... স্যাওড়া গাছে পেত্নি বইসেছে...।।পেতনী ও সাকচুন্নি ...। লীচে নামোগো ...... সাঁঝ হইচে ...টুকুন কথা বলে ঘরকে যাই ...

(সোনামনি নামে, ১৬ , ১৭ বছরের মেয়ে)

সোনাঃ ধুর , তুমি কি... ভয় ডর লাই...। ইত কষ্ট কর্য়ে , ভয় দিখ্যাতে গাছে উঠলাম ...

গুনঃ আমি বিপুল স্যরের ছাত্র ...। বিজ্ঞান পড়ি ...সাইন্স...the mother of all subjects.... যুক্তি ছাড়া কিচ্ছু বিশ্বাস করি না ...

সোনাঃ ব্যস সুরু হল জ্ঞানের কথা ...যেদিন সত্যি করে ঘারে চাইপবে লা ...বিজ্ঞান অজ্ঞান হয়ে যাবে দিখে লিও ...

গুনঃ ঘারে তো চিপেছে ...

সোনাঃ কি?

গুনঃ পেতনি তো ঘারে চেপেছে ...।

সোনাঃ তবেরে ...(মারতে যায়, গুন হাত ধরে ফেলে)...ছাড় , লাগে ...

গুনঃ আহারে পেত্নীটোর নরম হাতে লিগেছে গো?

সোনাঃ ছাড় ...শোণো যে কথা বুলতে ডেকেছি ...

গুনঃ বলুন আমার জন্য কি আদেশ মহারানী...

সোনাঃ আমাকে অঙ্ক করাতে হবে...

গুনঃ কি?

সোনাঃ হ্যা...টেস্টে রেসাল্ট ভাল হয় লাই...

গুনঃ কত

সোনাঃ সুনে কি হবেক?

গুনঃ বলনা ...

সোনাঃ কাউকে বুলবে না তো ...

গুনঃ না রে বাবা বল কেনে ...

সোনাঃ ২২...

গুনঃ হাসে...

সোঃ ই জন্য বলতে চাই লাই... সবাই তুমার মত আইনস্টাইন হবে নাকি...

গুনঃ তা এত মাস্টার থাকতে আমি কেনে?

নাটক তমোজিৎ রায়

সোনাঃ বুকার মত কথা বল কেনে? শিমূল বনী তে আর কে আছে... অঙ্কতে একশ ... বাবা বুল্যেছে...

গুনঃ কি?

সোনাঃ তোমাকে বলতে...

গুনঃ আরে সালা...সরি ...আমার তো ভাগ্য ফিরে গেলো রে...আমার খরুস সসুর...আমার কথা...

সোনাঃ কি ? কি বললে?...।পড়ব না , যাও ...(হাঁটা দেয়)

গুনঃ সোনা...এই সোনা... যাসনা রে , রাগ করেনা রাগুনি,... রাঙ্গা ফুলের বিনুনী... সোন আমি তুকে অঙ্ক করাব... আর সোণ তুর বাপ রাজা হরিস চন্দর... কিন্তু এই কথাটা বলতে এতদূর ডাকলি রে? শুধু এই কথাটা ...

সোনাঃ আর একটা কথা আছে?

গুনঃ কি?

সোনাঃ থাক বলব না , যাই ...

গুনঃ না ...বল

সোনাঃ বুলব?

গুন(মাথা নাড়ে, সোনা কানে কানে বলতে যায়, হঠাত খিল খিল হাসির শব্দ গাছের পেছন থেকে)

সোনাঃ মাগো...

গুনঃ কে কে ওখানে?

(৪০ , ৪২ বছর বয়স্ক মহিলা হাওয়ামনি , হাতে আদিবাসী পূজার উপকরণ)

হাওয়াঃ কি ছাইঞ্জ বাবু, ডর পেলি...হা?(হাসে)

গুনঃ মুটেও লা...।

হাঃ হেই দেখোগো মিছা কথা বড় দোষ , লাকের আগায়...।।

সোনাঃ হায় গো হাওয়া দিদি... সাঞ্জের বেলাটায় ইমন করতে আছে...

হাঃ আহারে সোনা...ইমন করতে আছে? লিজে কি কুরতে ছিলে গো? গাছের ডালে উঠে পেতনি সেজে ...

সোনাঃ হেই মাগো ... তুমি সব কিছু ...

হাঃ হ্যাঁগো মা ... পুজা দিতে এইসেছিলাম বুড়ীমার থানে... ফির্যার পথে দেখি টোনাটুনি মিল্যে...

সোনাঃ ছি , ডাকোনাই কেনে দিদি?

হাঃ ডাকলে সিনেমাটো দিখ্যা হত কি?

সোনাঃ কি লজ্জা ...

হাঃ আর সরমটো কর্যে কি হবেক ? এ সিমুল বনীর মাঠীয়া ইন্দুর গুলাও জানে তুমাদের ...(সোনা মুখে হাত দেয়) কি ছাইঞ্জ বাবু ঘরকে যাবে লাই...।।?

গুনঃ কিসের পূজা দিলে গো বউদিদি ...

হাঃ আর কি , তুমার দাদার সরীল টো সারে না কিছুতেই ...।তিন দিন ধর্যে সার লাই...। খায় না ...দায় না ...পূড়ে পূড়ে ঝীমায় খালি...। আজ দেখি পেট্টাও কিমন ফুলা ফুলা...

গুনঃ পূজা টুজা না দিয়ে ডাক্তার দেখাও...

সোঃ তুমার মুখ্যে কি কিছু ...পুজা দিবে না তো কি ...অসুখ কর্যেছে...

গুনঃ পূজা দাও দাও। কিন্তু একটা ভাল ডাক্তার দেখাও, ব্লাড টেস্ট হইয়েছে ...

(হাওয়া মাথা নাড়ে)

গুনঃ কাল আমি যাব ...। গোবিন্দদা কে লিয়ে ...উ রক্ত লিয়ে লিবে...

হাঃ না তুমি যাবে না গুনধর ...আমার সাসুরী ইসব চায় না বটে ... কবরেজ দিখ্যেছে ...ঝাড়ফুঁক কর্যেছে ...

গুনঃ উফ ।।তোমরা ইখনো ইসব...

হাঃ কি করব বল? একের পর এক ঘটনা ঘটছে ঘরে...। ভাসুর গেল ...দুদুটা দুধেল গাই এইবার তুমার দাদা ...আমার কপাল্টাই পুড়া গো ...

গুনঃ ইসব বোকার মত কথা বুল্যে লাভ আছে কি? বলরামদাকে বাঁচাইতে হবে...। ইভাবে হবে না , কাল আমি যাব ...। আর গোবিন্দদাকে লিয়েই যাব

সোনাঃ না যাবে না , উয়াদের ব্যাপার উয়ারা বুঝবে কেনে ...। তুমি কেন মিছামিছি ইসব ...ঝামেলায় ...

গুনঃ ছি ... ছি...।(চলে যায়)

সোঃ গুনদা শোন ...শোন ...

হাঃ গুনধর যায় না , দাঁড়াও কেনে ... আচ্ছা কাল ঘরকে এসো তুমি...। হাঁ ডাগদার লিয়ে এসো ...পাগল ছিল্যে একটা (সোনামনির দিকে তাকায়, সোনামনিও রাগ করে চলে যায়, ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে)

(আলো নেবে)

দৃশ্য–৩

(voice over এ গুনধরের গলা: যেতে আর হ'ল না স্যর , সেদিন ই যা হবার হল। হাওয়ামনির বাড়ীর উঠান , একটা মৃতদেহ চাদর দিয়ে ঢাকা , বয়স্ক এক মহিলা মাথা নীচু করে বসে...। এক গুনীণ চোখ বন্ধ করে , মৃতদেহ ছুঁয়ে বসে কি বিড়বিড় করছে ...পাশে দুয়েক জন নারী পুরুষ ...হাওয়ামনি ঢোকে... দেখে হাত থেকে থালা পড়ে যায়, ছুটে আসে মা হাত ধরে আটকায়)

মাঃ ধরবেক লা, আমার ছিল্যের গায়ে হাত দিবেক লা তুমি, হাত কিটে ফেলব

নাটক তমোজিৎ রায়

হাঃ মা মু পূজা দিতে ...

মাঃ চোপ সালি ভাতারখাগী।। পুজা? পাড়া ঘুর্‌ন্যে ইসে ...সতিপনা দিখ্যাচ্ছ বটে? তুমার সামি আর লাই ...উয়াকেও খেইয়েছো তুমি...

হাওয়া হাউ হাউ করে কাঁদে ...

মাঃ থাক, লোক দিখ্যানো তামাসা কুরতে হবেক লাই ...চল্যে যাও ...ই ঘরে তুমার ঠাঁই নাই ...যাও...(কেউ কিছু বলতে যায়) চোপ কেউ মুখ খুলবেক লা ...সবাই চুপ যাও ...ই হারামজাদী মানুষ লা ...। সাত বছর হয়ে গেল পেট হল না ...উলটা দু দুটা জুয়ান ছ্যেল্যা ...

হাওয়াঃ ঠিক ঠাক ডাক্তার তো দিখ্যে লাই মা ...

মাঃ (এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে) আরে হারামজাদী ...মুখে মুখে কথা বুলছে দেখো ... এখোণো মুখে কথাটো আসে তুয়ার ? দু দুটা জান খেইয়ে ...। কুথা বলছে ...যা চল্যে যা ...পালা সালি

হাঃ কুথাকে যাব মা... মুর যে কেউ লাই... কুন ঘর লাই ...

মাঃ লাগরবাড়ি যা... গতর বেইচে খাগে যা ...। এই রাধামনির ঘরে তুর ঠাঁই হবেক লা... যা

(গুনীন হঠাত উঠে দাঁড়ায়)

গুনীনঃ না , যাবে না , উয়ার বিচার হবেক, ই বাড়িতে যত পাপ কর্‌য়েছে ...তার বিচার... ঈ সাল সিমুল বনীতে সুখা হইঞ্ছে ... চাষে ক্ষতি... দুদুটা গাই মর্‌য়ে গেঞ্ছে ... তারপর দুদুটা জুয়ান বেটাছিল্যা ...। কে খাইল কে?

(সবাই হাওয়ার দিকে তাকায় , হাওয়া ভয় পায়)... তু সালি মানুষ না ...। বেটি ছিল্যা না ... তু (সবাই বলে ডাইন)

হাঃ না ...(সবাই ওকে ঘিরে ধরে, ও হঠাত মাচার পাশে একটা রাম দা নিয়েনেয়)হেই কেউ কাছটোতে এসো না ... খুনখারাপি হয়ে যাবে ...

মাঃ কাটারি ফিল্যে দে ডাইন...।

গুনীণঃ ফেইল্যে দে, ঝেইর্‌য়ে দুব, তুয়ার কিছু হবেক লাই...।নাইলে পুড়ায় দুব তুরে...।

হাঃ কাছে আসবেক লা বুলতেছি ...

গুঃ আগুনে পুড়ে যাবি ডাইন, মুর কাছে আয় বটে (ওরা ক্লোস হয়, হাওয়া কাটারি ঘুরায়, আলোর খেলা, চিৎকার করে গুনীন , হাওয়ার মুখে রক্তের ছিটে ..., পড়ে যায় গুনীন, ট্রেনের শব্দ, আলো...তারপর আলো কাটে)

দৃশ্য–৪

(ট্রেনঃ স্যর আর চশমা চোখে গুনধর)

গুনঃ হাওয়ামনি প্রথমে আমার বাড়ি যায় স্যর , ...তখন রাত নটা...। হাতে কাটারি, চোখেমুখে রক্ত...আমি তো স্যর একা থাকি ...কি করব ঠিক ...

স্যরঃ তুই থানায় গেলি না কেন ?

গুনঃ থানায়ই তো গেছি স্যর ... দূর থিক্যে পুলিস ফাড়ির সামনে দেখি ...উয়াদের পাড়ার সব লোক জড় হইঞ্ছে ...খুন্‌ টুন কি সব বুলছে...। ডর খেইয়ে গেলাম স্যর ... উখানে গিলে বউদিদিকে তো ... উরা...

স্যরঃ আমার বাড়ি গেলি না, ... ও আমি তো তখন আবার কোলকাতায় , হেডস্যর?

গুনঃ গেছিলাম স্যর , বললাম স্যর কিছু করেন , আজ রাতটা অন্ততঃ বউদিদিকে রাখেন ...

স্যর ...বললেন থানায় যা ...তোর ম্যাডামের শরীরটা ...তারপর গেলাম সোনামনিদের বাড়ি...

(মঞ্চের এক কোনায় সোনামনিদের বাড়ির দরজায় হাওয়া মনি কে দেখা যায়, আর গুনধর স্যরের পাশে বসেই কথা বলে)

গুনঃসোনা সোনা দরজা খোল ...

(সোনা মনির বাবা বেড়িয়ে আসে)

বাবাঃ এত রাত এ কে... একি তুমি তুমরা ... ই সব কি বটে? তুমার মুখে কিসের দাগ? রক্ত ...কেনে ।। কি হইঞ্ছে?

গুন; সব বলছি কাকা, টুকুন ভিতরে যেতে দাও কেনে ...

(সোনা বেড়িয়ে আসে) সোনাঃ হাই মাগো ...হাওয়া দিদি কি হল? ভিতরে আস কেনে...

বাপঃ না ...তুই ভিতরে যা ... কি হইঞ্ছে গুনধর? খুল্যে বল...

গুনঃ বউদিদির সামি আর নাই কাকা, উরা বউদিদিকে ডাইন বুল্যেছে ...পুড়ায় মারতে চেইঞ্ছে বউদিদি তাই কাটারি দিয়ে...।

বাপ; খুন সর্বনাশ ... আমার বাড়িতে না থানায় যাও ...।(চিৎকার শোনা যায়

গুনঃ উয়রা ইসে পড়বে কাকা...। সোনা...

সোনাঃ বাবা ইদের বাঁচাও বাবা...।

বাপঃ চোপ... ভিতরে যা, চল্যে যাও... চল্যে যাও ... গুনধর তুমি ভাল ছেল্যে... সামনে পরীক্ষা ... ইসবে জড়ায়ো না ... বিপদ হবে... তুমার উজ্জ্বল ভবিস্যত ...

(সোনার হাত ধরে ভেতরে চলে যায়, ওদিকের আলো কাটে)

গুনঃ ভবিষ্যৎ , স্যর আমার ভবিষ্যৎ ...দেশটা আন্ধারে ডুব্যে যাচ্ছে ... একটা মেয়েকে চখের সামনে ডাইন বুল্যে পুড়ায় দিবে আর আমি পরিক্ষার খাতায় রচনা লিখব ।।'কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান'... এ শিক্ষা আমায় দিছেন নাকি স্যর...

স্যরঃ কিন্তু এ জন্য তোর সবকিছু চলে গেল গুনধর, তোর

কেরিয়ার, তোর গ্রাম, তোর ভালোবাসা, সম্মান।

গুনঃ একটা মানুসের জীবনের কাছে এসব কিছুনা স্যার, কিচ্ছু না ... আর সত্যের কাছে তো ... একদিন না একদিন সবাই বুঝবে ... বুঝবে তো উয়াদের দুইভাইয়ের হেপাটাইটিস ছিল... ইর সাথে বউদিদির কোণো ...ডাইন ফাইন কিছু না ... বুঝবে তো?

স্যরঃ সবাই তো সব জানে, সব বোঝে গুনধর ...সব ঘরেঘরেই তো এখন টিভি ...

সিরিয়াল দ্যাখে, অবু চেতনা হয় নাই রে , শিক্ষা আছে তবু শিক্ষার আলো মনের কালোগুলো কে... কিন্তু মনের এত আলো নিয়েও জীবনে এত কালো নেমে এলো কেন গুনধর? তোর চোখের আলো ছিনিয়ে নিল কে?

গুনঃ টেরেন লেট আছে স্যর, বনগা আসতে দেরী আছে, শুরু যখন কর‍্যেছি ...গপ্পটা আপনাকে বুলেই ছাড়ব ...। তারাগে আপনার রেহাই নাই ...। ছাত্রের হাতে কেমন জব্দ স্যর? চা খাবেন গলাটা কেমন সুখায় গেঞ্চে ... চা এই চা ...দাও দেখি দু কাপ লিকার, ও একটা চিনি ছাড়া ...মনে আছে স্যর ......

(স্যরের চোখে জল , ওর মাথায় হাত দেয় , চা ওয়ালা চা দেয় , চা হাতে নিয়ে বলে চলে)

রাতের ট্রেনে শিমুল্বনী ছাড়লাম ...গেলাম পুরুলিয়া ...। , উখান্যে বউদিদির একটা কাজ জুটে গেল ...রান্নার হাত ভালো ছিল, বাসন কোসোন ও মাজতো ...।

স্যরঃ আর তুই ...।

গুনঃ জানেনই তো স্যর , ইলেক্ট্রনিক্সে আমার মাথাটো একটু বেসি খুলে, টী ভির দুকানে একটা কাজ ...পেইয়ে গেলাম ... দু হজার দিতো আর দোকান ঘরে সোবার ঠাই ...। ভালোই চলছিল স্যর বউদিদি আর দেওরের সংসার ...।। গুনধর সোরেন আর একটা ডাইন ...(হাসে, ট্রেনের আলো কাটে)

দৃশ্য–৫

(আলো জ্বললে দেখা যায় , হোটেলের ই ছোট একটা ঘরে হাওয়া মনি সাদা সারি পড়ে বিছানা গোছাচ্ছে আর টুসু গান গাইছে দরজায় ঠকঠক, চমকে ওঠে হাওয়া)

হাঃ কে

গুনঃ বউদিদি , বউদিদি গো ...

হাঃ কে

(জানালার পর্দা সরিয়ে মুখ বের করে গুন)

গুনঃ মু গো । শ্রী শ্রী শ্রীমান গুনধর সোরেন ...

হাঃ তুমি চলে যাও গুনধর ভিতরে এসো না ...

গুনঃ কেনে আসব না কেনে? আমার বউদিদির ঘর

হাঃ বললাম তো মুর কাজ আঞ্চে , যাও ...

গুনঃ আরে গরম গরম জিলাপি ইনেছি ... খুলো কেনে , এক কাপ চা খাবো আর পলায় যাব

হাঃ (দরজা খোলে) এ ভাবে হুঠহাট ইখান টায় ইসো না গো ছাইঞ্জ বাবু , লোকে ভালো মনে লেয় না

গুনঃ লুকের কথা ছাড়ো কেনে...নাও গরম গরম জিলাপি খাও আর এক কাপ চা পিলাও দেখি...

হাঃ লোকের কুথা বাদ দেওয়াক যায় লা ছাইঞ্জ বাবু... ইটা বড় সহর বটে ।। পুরুল্যা ... উনেক কস্টে মাথাটো গুজবার ইক্টা ঠাই জুটেঞ্চে ...ইটা চলে গেলে ...

গুন: নতুন বাসা পাব...পিথিবীটা অনেক বড় বউদিদি , অনেক অনেক বড় ...সেখানে আমাদের একটা ঠাই ঠিক হয়ে যাবে... দেখো ... হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা , অন্য কোণো খানে ...। লাও চা পিলাও ...

হাঃ হবেক লাই , চা পাতা লাই ...

গুন : আরে আগে বলতে হয় ...(হঠাত একটা খাতা দ্যাখে) ...হাইবাপ ...ইটা কি? দেখি দেখি ...

হা: না রিখ্যে দাও , দিখবে না , আমার মাথার দিব্যি...

গুন: উসব আমি মানি না গো ...লাভ নাই ... (খাতা খুলে পড়ে) গুনধরের জন্য আমার বড় দুখ। একটা ভাল ছেলে মুর কারন... (খাতা নিয়ে নেয়) আরে বউদিদি তুমি

হা: কেলাস ফর।।

গুনঃ ই কথা তো জানা ছিলো না বটে? সুন গুনধরে মুর্ধন্য হয়, আর দুখ না ওটা হবে দুঃখ ... দ এ হস্যু ...

হাঃ চুপ যাও কেনে ... ছাইঞ্জ বাবু , তুমাকে আর মাস্টার গিরি করতে হবেক লাই ...

গুনঃ তা আমার জন্য দুখ কেনে?

হঃ হবেক লাই ? বল? লিজের দিকে একবার তাকায়ে দিখেছো (আয়না ধরে) দিখ কেনে , চেহারাটো কি হইয়েঞ্চে ...তুমি সিমুলবনীর গব্ব ... ইস্কুলের মাস্টার গুলা সব্বাই ...তুমারে লিয়ে কত কি বল্যে ...আর তুমি...

গুনঃ কি

হাঃ একটা ফালতু বেটীছিল্যা'র কারন , বাঞ্জ , সামী খাগী ...

গুনঃ ছি ...এসব বাজে কথাগুলা আমার সামনে বলো না বউদিদি ...

হাঃ তুমাকে দিখলে মুর মরে যাবার সাধ হয় ছাইঞ্জবাবু... মু'র কারন তুমার সব গেল...সব হাওয়ামনির পাপ ...

গুনঃ আবার , কি সব গেল? কিচ্ছু যায় নাই আমার , আমার বিশ্বাস আমার শিক্ষা আমার বিজ্ঞান আমার সাথে আছে, আর তুমি লিজেকে

নাটক তমোজিৎ রায়

ছোট ভেবো না , তুমাকে যারা ছুট বলে তারাই ছুট ...শিক্ষার আলো তুমি পাওনাই ...। এ দেশের কোনায় কোনায় ছড়ায় থাকা মেইয়ে দের মত ...। শিক্ষা পেলে তুমিও অসাধারন হবে , বুলে দিলাম ...।তুমায় আমি লিখ্যা পড়া সিখ্যাব বউদিদি ...

হাঃ ইমন কথ্যা বলে না ছাইঞ্জবাবু , তুমার সামনে একটা পুরা জীবন পড়্যে আছেক গো ...। কত বিদ্যা তুমার , তুমি গাঁয়ে ফিরে্য যাও কেনে

গুনঃ ফিরব ফিরব বউদিদি... একা লয় , দুইজনায় একসাথে ফিরবক ...আমাদের যত অপবাদ , তুমার যত অসম্মান সব ঘুচায় ... ফিরবক... বুল্ব...বউদিদি ডাইন না ...। ডাইন বুল্যে কিছু হয়না রে বুকার দল... পড় পড় বিজ্ঞান পড় ...শিক্ষিত হ কেনে ...

হাঃ পারবে? তুমি পাইরবে গুনধর ? জানি পাইরতে লারবে ...মুদের লিয়ে কত বাজে কুথা রইটে গেচ্ছেক সিমুল বনীতে ...

গুনঃ জানি, সুবলা ইস্যেছিল, বইলেছে ... তবে আমার বন্ধুরা আমার পাসে আছে বউদিদি, স্যর রাও ...

হাঃ আর সোনামনি?

গুন; আছে উয়াও আছে, আমি ঠিক জানি , বাপের কারন চুপ মাইরে আছে ।। উ আমাকে ভালবাসে বউদিদি ...। উর মাধ্যমিক টা হয়ে যাক ... আসছে দোলে... সোনামনিকে পরথম আবিরটো আমি লাগাব বউদিদি, সিমুল পলাসের রঙ্গে লাল হবে সিমুলবনীর আকাস...মাটি আমরা গাইব ...

(গান ধরে, হাওয়া গলা মেলায়, খোলা দরজায় হঠাত সোনামনি এসে দাঁড়ায়)

সোঃ (হাততালি দেয়)

বাঃ চমৎকার, বেস সুখেই আঞ্ছ বটে ...

হাঃ আরে সোনা তু ইথাকে ...।

গুনঃ ইকা ইকা

সঃ বাবা আছে লীচে...

হাঃ লিয়ে আয়...

সঃ বড় অসুবিধা করলাম না? চল্যে যাব ...ইখনিচল্যে যাব আমি ...

গুনঃ ভিতরে আয় সোনা ...

সঃ না, আসবক লা, ইখানে ঢুকতে ঘিন্না করছে আমার... যা শুনেছি সব তাহলে...ঠিক ...

গুনঃ কি ঠিক ... (হাত ধরে)

সঃ হাত ছাড় ... মুকে ছুবে না তুমি...।। ছি ছি ছি গুনদা...।ইতটা লিচে নামতে পারলে গো ... একটা বিধবা মহিলা...

গুনঃ চড় মারে

হাঃ গুনধর ইটা কি করলে তুমি...

সোনাঃ খুব লাগল না তুমার হাওয়াদিদি ? আমার জীবন্টা লস্ট কর্যে দিয়ে ...এইখন দরদ দিখ্যাচ্ছ হাঁ? সব্বাই সব্বাই ঠিক ই বল্যে, তুমি মানুষ না , তুমি একটা ডাইন ...

গুনঃ সোনা তু চল্যে যা , চলে যা তু ...ইতটা অসিক্ষিতের মত কথা বুলতে কে সিখ্যাল তুকে?

সোঃ চুপ একদম চুপ ...। সিক্ষ্যা দিখ্যাতে এসো না ...। অনেক সিক্ষিত দিখ্যেছি গো, ঘেন্না ধরে গেল পড়াসোনাতে ...আর পড়ব না ... বিহা করব...সুনলে সিক্ষিত মানুষ ...। তুমার সিক্ষায় আমি...থু ... ইখানে আসাটাই মোর ... যাই ভালো করে সংসার কর দুজনে...

হাঃ ইমন কথা বলে না , সোনা , পাপ লাগে, যা ভাইবছ তুমি সব ভুল, মিথ্যা ...

সোঃ আর কুথা বোলো নাগো হাওয়া দিদি...সবাই অনেক অনেক খারাপ কথা বুল্যেছে ...কিচ্ছু বিশ্বাস যাই লাই, কিচ্ছু না, কিন্তু লিজের চোখকে কি করে ...(কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে যায়)

হাঃ সোনা সোন...।সুন্যে যা... যাস নারে ...যাও দাঁড়ায় থিক্যো না যাও , উকে আটকাও

গুনঃ না আমি যাবোক লা বউদিদি, উকে যেতে দাও ...যে আমাকে বিশ্বাস করে না , এতটা কলুষ ভর্যে আছে যার মনে... তারে আমি ভালবাসব কি করে ? সব সহ্য করতে পারি বউদিদি অসিক্ষা সহ্য হয় না ...

হাঃ যাও , চলে যাও , চলে যাও তুমি ই ঘর থিক্যে ...আর কুনদিন আসবেক লা ...। যাও ...(ঠেলে বের করে দেয়)

(জানালা দিয়ে গুনধর মুখ বের করে)

গুনঃ আমি আসব বউদিদি , কেউ না জানুক , আমি তো জানি আমি ঠিক, তুমি ঠিক... বিজ্ঞান জানে... চারপাশটা বড় অন্ধকার দিদি , লান্টেমটা একটু ধরবে ...।

(হাওয়া মনি আলো ধরে, ও চলে যায়)

হাঃ ই পোড়া মুখ দিখ্যো না গো তুমি ছাইঞ্জবাবু, মু মানুষ না ...মু ডাইন আছি ...। ডাইন... মুর চোখে বিষ, সাসে বিষ , সারা সরীলে বিশ .. তুমার জীবোণ্টো ছারখার হয়ে যাবেক গো ...(হাউমাউ করে কাঁদে হাওয়ামনি , ট্রেনের শব্দে আলো নেবে)

দৃশ্য–৬

(আবার ট্রেন , খুব জোরে চলছে , সাথে আবার মেঘ ও ডাকছে)

গুনঃ স্যর, ও স্যর, চুপ কর্যে আছেন কেনে? মেঘ কর্যেছে স্যর? বৃষ্টি আসবে লয়? ছাতা আছে তো ...। কি বলি আরে ছাতা ছাড়া বিপুল স্যর ভাবা যায়! সেই ছাতাটাই তো ? হ্যা? যেটা একবার আমার পিঠে ...

নাটক তমোজিৎ রায়

স্যরঃ কেন বাজে কথা বলছিস? তারপর কি হল বল...

গুনঃ হাঃ হাঃ , খুব interesting না , গল্পটা? যেন একটা thriller ...

স্যরঃ এভাবে বলিস না তুই ...

গুনঃ সরি স্যর ...। আপনি কস্ট পাবেন না , একটু মজা করলাম, কতকাল পরে লিজের ঘরের লোকের সাথে দেখা ...সিমুলবনীর গন্ধ ...।আহ ...পরান ভরে আসে...

স্যরঃ তোর কথাটা শেষ কর গুনধর...

গুনঃ বলি স্যর , আর এক কাপ চা...।।এই চা(দুটো চা নেয়, চা খেতে খেতে বলে)

সেদিন রাতেই হোটেলের মালিক হাওয়ামনির ঘরে যায়(দরজায় ঠুক ঠুক, হাওয়া মনি লণ্ঠন জ্বালায় আমরা লণ্ঠনের আলোতে সেই ঘরটা দেখি, দরজা খুলে দেয় হাওয়ামনি , চাদর মুড়ী দিয়ে মুখ ঢাকা হোটেলের মালিক , ট্রেনে'র অংশেও আলো যেখানে কথা বলছেন গুনোধর আর স্যর) হয়তো রোজই যেত , বউদিদি বল্যে নাই আমাকে, হয়তো উটাই ছিল বউদিদির চাকরী বাঁচানোর গোপন terms and condition ....

(আবার ওই ঘরের আলো , লণ্ঠনের আলো ...ট্রেনের আলো কমে)

মালিক ঃ পা টা বড় , টনটন করছে রে , একটু টিপে দে না হাওয়া ...কি মিষ্টি নাম তোর ...। বললেই বুকের ভেতরটা ছলাত করে ওঠে ...। হাওয়া, হাওয়া মনি ...... সিরিয়ালের মত , দেখিস না , বাহামনি ...ভারী মিষ্টী রে...... তবে তোর মত না , কি সুন্দর তোর গরন ...। এই খানে বোস... টেপ টেপ ...আহ ...এবার একটা গান শোনা ...। শোনা না ...আরে তোর লাগরের সাথে আজ গাইছিলি যে...

(গানটা উচ্চারন করে , শুইয়ে দেয় , আলো কমিয়ে দেই, আবার ট্রেনে আলো)

গুনঃ আপনার সামনে বুলতে খারাপ লাগছে স্যর ,...ঘনিষ্ঠ অবস্থায় হঠাত ম্যানেজার বাবু গড়িয়ে পড়ে যায়

(ঘরে আবার আলো , ট্রেনের আলো কমে)

(মাটিতে শুয়ে ম্যানেজার বাবু , দেহ নিথর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাক, বউদিদি রক্ত হাতে নেয়, পাগলের মত হাসতে থাকে , ট্রেনের শব্দ, ট্রেনের দিকের আলো জ্বলে , ঘরের আলো কাটে)

গুনঃ সারাটা রাত মৃতদেহ আগলে বস্যে ছিল বউদিদি, থির , যেন বাঘমুন্ডির পাহার ...সকাল বেলা শোরগোল ...কলরব। হোটেল মালিকের বউ , তার ছেল্যে বউদিদিকে খুব মারে স্যর।হাত জুতা ...আমি তো স্যর কিছুই ...গায়ে মুখে তিন চার টো ...ফোস্কা লিয়ে বউদিদি আমার কাছে আসে । খবর তো দাবানলের ছড়ায় , ... তাই আমার চাকরীটাও চল্যে যায় স্যর ।

স্যরঃ তারপর?

গুনঃ বউদিদির তখন বদ্ধমূল ধারনা উ ডাইন , না হলে এতগুলান মৃত্যু ?! কি করে বুঝাই স্যর , উয়ার ভাসুর আর বরের ছিল হেপাটাইটিস , আর বউদিদিকে ডাইন বানাইলে বাকি ভাইদের সম্পত্তির সুবিধা...আর ম্যানেজার বাবুর হইঞ্ছিল বেসি বয়সে উত্তেজনায় স্ট্রোক ... কি করে বুঝাই ...অশিক্ষা অশিক্ষা ...

স্যরঃ তারপর কোথায় গেলি তোরা ?

গুনঃ মহাশ্বেতা দেবীর কাছে

স্যরঃ মানে?

গুনঃ আরে সাহিত্যিক , লেখিকা স্যর , অরন্যের অধিকার...

স্যরঃ তাঁকে পেলি কোথায় ?

গুনঃ সেদিন কাগজে দেখি, পুরুল্যা এসেছেন উনি ...সাহিত্য সভায় ...। শুনেছি সাঁওতালদের লিগ্যে উয়ার নাকি খুব দরদ , আমি সাওতাল না মানুষ হইয়ে গেলাম তাঁর কাছে ...।সবটা শুনলেন, তারপর একটা ফোন করলেন 'একটা ছেলে পাঠাচ্ছি , ওকে তোমার এন জী ও তে চাকরী দিও ...একটা কথা ও কিন্তু একটা ডাইনি পোষে'' ......হাঃ হাঃ স্যর কি রসিক মানুষ এই মহাশ্বেতা দেবী বলেন...ডাইনি পোষে ...।হাঃ হাঃ ...গেলাম ঝারগ্রাম ...।দিদির চিঠী লিয়ে , চাকরী হইয়ে গেল ... উন্নত জাতের হাঁস ছাগল , শূয়োর চাষে উৎসাহ দিতে হবে সাঁওতাল দের ...সাঁওতাল ছেল্যে হইলে ভাল হয় , লিখ্যা পড়া জানা ...আমি তো স্যর যাকে বলে ফিটেস্ট ...

স্যরঃ এত খুব ভালো হয়েছিল , আর হাওয়ামনি ?

গুনঃ বউদিদিরও চাকরী হয়ে গেল ঝারগ্রামের এক অনাথ আশ্রমে...এই বাচ্চাদের দিখ্যাসুনা আর রান্না করা কাজ ...উরাই করে দিল ...জানেন স্যর এন জি ও বাবু বলে ' do you love her? বিয়ে করে নিন না ওকে' ...।

(জিভ কাটে, কান ধরে)

ছি ছি স্যর , উয়াকে বললাম, ইটা আমার বউদিদি ...। আমি কিছু চাইনা স্যর ...শুধু দিখায় দিতে চাই ...ডাইন বুইল্যে কিচ্ছু হয় লা ...।। ডাইনের সাথে থাকলেও ......না ...।।হাঃ হাঃ গুনধর ডাইন পোষে ......

(বৃষ্টি নামে) স্যর ...।বৃষ্টি তাহলে নামল স্যর ......সোঁদা মাটির গন্ধ ......। এবার তালে সুখা হবেক লাই ......

স্যরঃ ভালোই তো ছিলি গুনধর ...। তারপর হঠাত ...!?

গুনঃ ক্লাইম্যাক্স স্যর... বলছি ... ভালোছিলাম, খুব ভালো ছিলাম...। কত কাজ ...বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পশুপালনের শিক্ষা , শিক্ষাদানের

নাটক তমোজিৎ রায়

চাইয়ে আনন্দের আর ...। বিনা ডিগ্রির শিক্ষক ...।। চিরটাকাল তো তাই হইতে চাইছি স্যর ...। আপনার মত শিক্ষক... মাঝে মাঝে জ্ঞান ও দিতাম অন্ধ বিশ্বাস কুসঙ্গকারের বিরুদ্ধে লেকচার, ফ্রিতে ... হাঃ হাঃ স্বভাব যায় না মলে ...। পড়াসুনাটাও সুরু করে চিলাম স্যর, প্রাইভেটে ...

স্যরঃ আর হাওয়া মনি ?

গুনঃ হাওয়ামনি খুব ভালো ছিল স্যর ...।। বাচ্চাটাচ্ছা 'র সাথে ...কুনদিন মা হয়নাই তো ...।। হবেও না ...তাই মনের ভিতরের মা টা যেন জেগ্যে উঠেছিল ......

(আলো নেবে)

দৃশ্য- ৭

(অনাথ আশ্রমের কোণো একটা ঘর, দুটো বাচ্চাকে গল্প বলছে আর খাওয়াচ্ছে হাওয়ামনি, ওর ভাষাটা পালটেছে একটু , চেহারায় এসেছে খানিকটা শহুরে ছাপ)

হাঃ তারপর সেই রাজার কুমার, ডানাউলা ঘুরায় চেইপ্যে...

বাচ্চারাঃ পঙ্খীরাজ?

হাঃ হা ...গো পঙ্কখীরাজ ...চেইপ্যে ...গেল রাক্ষসদের দেশে ...।আরে খাও কেনে খাও, মুখেরটা সেশ কর তাড়াতাড়ি ...

১: তুমি বলনা সেখানে কিকি রাক্ষস ছিল?

২: তারা কি খুব ভয়ঙ্কর?

১: কুলোর মত কান?

২: মূলোর মত দাঁত ?

হাঃ আরে খাবার সময় কথা বলে না ...সেই রাক্ষসের বিসাল সরীল ...। বাঘমুন্ডির পাহারের থিক্যেও বড় ...আর ইত বড় বড় দাঁত ...

১: মুখ দিয়ে আগুন বেড়োয় ?

২: জিভে বিষ?

হঃ আরে হা কর হা কর ... উ রাক্ষস হাঁ কর‍্যে রাজকুমারকে গিলতে আসে... আর রাজকুমার

(গুনধর এসেছিল একটু আগেই)

গুনঃ তার কোমর থিক্যে এইয়া বড় ...

দুজনঃ তরোয়াল ...

গুনঃ না তরোয়াল না কলম...কলম বের ক'রে যেই লিখলো ...। অ এ অজগর আসছে তেড়ে ...। আমটী আমি খাবো পেড়ে ... অমনি দত্যি দানো সব ইন্দুর ছানার মত ভয়েই মর‍্যে গেল...

১: যা তা আবার হয় নাকি গো?

২: কলম দেখে ভয় পেলো ...

গুনঃ পাবে না ? কলম বড় শক্তিশালী জিনিস গো ... উ তরোয়াল ফরোয়াল তো দূর, একে ফর্টি সেভেন ও উর কাছে নস্যি ...

সবাইঃ সেটা কি গো ?

গুনঃ বন্দুক , ... ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা ...।

দুজনঃ আরেব্বাস ... সত্যি নাকি?

গুনঃ তয় ? তালে আর বলছি কি? মন লাগায়ে লিখা পড়া করবে , বই কলম সক্ত হাতে ধরবে ... কুনো রাক্ষস তুমাদের টীকিটাও ধরতে পারবে না ...

ওরা: (হাত্তালি দেয়) কি মজা...

গুনঃ কি খাওয়া হইঞ্ছে? তো যাও ...মুখ হাত ধোও ...আর এই নাও চকোলেট ...ভালো করে ব্রাশ করবে ...

ওরা: বিকালে কিন্তু আরো গল্প শুনব... (ওরা অ এ অজগর বলতে বলতে চলে যায়, হাওয়া হাসে)

হাঃ তুমি কখন এলে গো ছাইঞ্জবাবু?

গুনঃ অনেকক্ষণ ...তোমার গল্প শুনছিলাম ...। জব্বর জমায়েছ তো ইদের সাথে?

হাঁঃ এই বাচ্ছা গুলানই তো মুর সব ... ইসব তো তুমার কারন ছাইঞ্জ বাবু কি বল্যে যে তুমাকে ...।মুর লিগ্যে এত করলে তুমি, লিজে কি পেইলে গো ?

গুনঃ সুরু হল সেন্টি কথা ...নাও ইবার হা কর , চকোলেট খাও ...

হাঁঃ মুকে বাচ্চা পেইলে নাকি...।

গুনঃ আরে মিষ্টী মুখ ...হা কর ...অ্যা হ্যাঁ ...(খায়) ইবার বল কেন?

হাঃ কেন ?

গুনঃ আমি হায়ার সেকেন্ডারি মানে উচ্চ মাধ্যমিক পাস দিছি ...।

হাঃ সত্যি?

গুনঃ হ্যা গো ফাস্ট ডিভিসন ...আজি রেসাল্ট বেরোয়েছে ...রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় , দুইটা লেটার ...মানে আসির উপর নাম্বার ...কি?

হাঃ ইস কতদিন পর মনটা খুশি কর‍্যে দিলে গো ছাইঞ্জ বাবু, মুর যে কি আনন্দ হচ্ছে ...আমি বুড়ীমার থানে ... (ভাবে যে সেটা সম্ভব নয়) ...কালি মায়ের মন্দিরে পুজা দুব গো ...।। ছাইঞ্জ বাবু দিখ্য একদিন তুমি অনেক উপরে যাব্যে গো ... ঈ আকাস টো তুমার মুঠায় ইসে যাবে ... আর ওই সিমুল্বনী'র মানুষ গুলান তুমার দিকে (ঘার তুলে দ্যাখায়) ইমনি কর‍্যে চাইবে ...। আর সোনামুনি সুনলে তো ...

গুনঃ সোনামনি,র বিহা ঠিক হয়ে গিছে বউদিদি

হাঃ কি? না না উকে আটকাও ... যাও গুনধর ...বুঝাও উকে...।ই কিমন কর‍্যে হবে ...। মুর কারন এতবড় একটা অনাচার...না না ... ঈ হয় লা ...

গুনঃ চুপ যাও , চুপ যাও কেনে বউদিদি ...সেদিনের পর থেক্যে ...উয়ার প্রতি আমার মনে কোণো ...

নাটক তমোজিৎ রায়

হাঃ না না , ইমনটা বলে না গুনধর পাপ লাগে... মু তো জানি তুমরা দুইজন লিজেদের ...কতটা .

গুনঃ ভালবাসি না , ইখন আর ...সব সহ্য হয় , নীচতা সহ্য হয় না , অসিক্ষা সহ্য হয় না বউদিদি ...

হঃ চুপ , চুপ যাও গুণধর ...জিদ ভালো কিন্তুক সবসময় ...(কথা বলতে বলতে এন জি ও'র ম্যানেজার আসে , ৩৫-৪০ বছর বয়স)

ম্যাঃ গুনধর... ও হাওয়ামনি তুমিও আছ ...। তোমাদের একটা কথা বলার জন্য ...busy থাকলে ...। আমি পরে

গুনঃ না না স্যর ...busy আবার কি...আপনি বলেন...

ম্যাঃ একটা announcement আছে ...। আমার এই এন জি ও টা আমি ......মানে তেমন return আসছিলো না ...funding টাও irregular হয়ে পড়ছে... হাজারো ফ্যাকরা ... govt enquiry ... audit ... একে ঘুষ , তাকে তেল... চ্যানেল বাজি...ভালো লাগছে না এসব...

গুনঃ এন জি ও ...বন্ধ করে দেবেন , মানে আমার চাকরীটা তাহলে আর ...

ম্যানেঃ no no certainly not... তোমার মত efficient employee কে ছাড়া যায় ? তোমার জন্য অন্য একটা offer আছে মানে if you wish ...

গুনঃ কি?

ম্যানেঃ আমি নতুন একটা বিসনেস ...শুরু করছি ...একদম নতুন concept বুঝলে ...। money market ... really unique one...আজ ফকির কাল রাজা... আজ দশ দিলে ...একবছরে ২০...। ৩০ এমনকি ১০০ ও হতে পারে... অদ্ভুত খেলা... মাল ঢালো ...মাল তোলো ...

গুনঃ আমি তো কিছুই ...

ম্যানেঃ বুঝবে ...বুঝবে ... ধীরে ধীরে সব ... আমি একটা money marketing company খুলছি 'স্বয়ং সিদ্ধা financial' ...আমার এন জী ও'র সব property হবে এই কোম্পানীর asset. তোমাকে এই কোম্পানী'র এজেন্ট করতে চাই ... এই এলাকায় তোমার একটা goodwill আছে... tribalরা তোমাকে চেনে , তোমার কথা শোনে , তোমাকে বিশ্বাস করে । তুমি ওদের গাঁথবে ... I mean ..ওদের বোঝাবে ...।

fund collect করবে...20% fixed commission...সেটা টাকার ওপর বাড়বে... বাড়তে বাড়তে ৫০ ... চাইলে নিজে investor ও হতে পারো ...একবছরে টাকা double...দেড় বছরে triple সাথে handsome commission ...কি?

তোমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে গুনধর, এখানকার গরীব মানুষের মুখেও হাসি ফুটবে, অবস্থা ফিরে যাবে ওদের, মাথার ওপর পাকা ছাদ, ব্যাঙ্কে টাকা... ভালো খাবে ভালো পড়বে ...। আর কি চাই? তোমার স্বপ্নটাও সত্যি হবে গুনধর, একটা স্কুল খুলতে চাও না তুমি? সাথে হস্টেল?...। ভাব গুনধর, ভালো করে ভাব।

(ও আরো কথা বলতে থাকে ট্রেনের শব্দে ঢেকে যায় কথা, আলো নেবে)

দৃশ্য-৮ (অন্তিম)

(ট্রেন , বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প)

স্যরঃ কি সব্বোনাশের খেলায় নামলি রে গুনধর...

গুনঃ অঙ্কে আমার মাথা বড়াবড়ি পরিস্কার স্যর, কিন্তু এ অঙ্কটা কিছুতেই মিলাইতে পারলাম না , এইটা বুঝতে পারলাম না যে এত কমিশন, এত interest কি করে হয়? স্যর, শিক্ষা, শিক্ষা করে এত তো গব্ব ছিল স্যর, ইত অশিক্ষিতের মতো কাজটা কি করে ...। লোভ স্যর , লোভ ...সব কিছু গড়বর কর্‍্যে দেয় ... কাঁচা পয়সা ...কলমের থিক্যেও সালা...। সরি স্যর ...পরথম পরথম ... অনেক কাঁচা পয়সা দেখলাম স্যর ... নিসা লিগ্যে গেল ... ইলাকার মানুসগুলান, ভাবতেও পারবেন না স্যর ...দিনে হয়তো রোজগার মেইরে কেইটে ১০০, ২০ টাকা কর্‍্যে জমা কর্‍্যেছে...কেউ কেউ আবার তিরিশ...। স্যর সুখের স্বপ্নে চোখ চকচক কর্‍্যেছে সব্বার...। বউদিদিও তিনমাসে একহাজার কর্‍্যে জমা দিল...ওই পাপ বাস্কে...

স্যরঃ তারপর ?

গুনঃ যা হবার হ'ল...লৌকাটায় ফুটা তো ছিলই ...জলও ঢুকেছিল ধীরে ধীরে ...রাজনীতির লুকেরাতো ছিলই, পুলিস টুলিস...বরবড় অফিসার ...সবাই কে খিলাতে খিলাতে ...। ডুব্যে গেল...হাজার মানুসের রক্ত জল করা সঞ্চয় ...স্বপ্ন...সব বানে ভেইসে গেল স্যর ...

স্যরঃ তখন?

গুনঃ মালিক তো ফুটে গেল ... তারপর আশ্রয় নিল জেলের নীরাপদ খাঁচায় ... মরলাম মুরা ...। যত এজেন্টের দল... একদিন আদিবাসীরা সবাই মিলে ধরল ...। মনের সমস্ত রাগ, হতাসা ...উগড়ে দিল ... চোখ দুইটা ফুইরে দিল আমার ... ভালো হল, খুব ভালো হইল স্যর...। প্রাইমারীর পড়া ভুইলে গেছিলাম লয়? 'লোভে পাপ ...পাপে...। ইখন শুধু কালো, অন্ধকার...। কালোটাকার কালি আমার দুই চোখে , আমার সারা জীবনের সাথে জুড়্যে গিল স্যর...। আর সবার চাইয়ে যিটা খারাব হল...।

ইতদিনে হাওয়ামনি প্রমান পেল যে উয়া মানুষ লয়, ডাইন, উয়ার সাথে থাইক্লে মা নুষ বাঁচে না ...। মুর লোভের পাপে লিজেকে পাপী ভাবল স্যর ... মুকে ছেড়্যে চলে গিল কুথায় ? কুন খবর

নাটক তমোজিৎ রায়

পাইলা,... কুথাও লা... এই যে ছবি...ইটা লিয়ে ঘুরি ...। দিখাই সবাই কে, যদি কেউ কিছু...। আর স্যর পড়াসুনাটা ছাড়িলাই। বি এ পড়ী...ব্রেইলে...মুক্ত বিস্ববিদ্যালয়...বাংলা অনার্স...বিজ্ঞান টা আর পড়া হল না ... তবে ...মনে মনে আমি পুরা বিজ্ঞানি স্যর... যেখানে যাকে পাই বিজ্ঞানের কথা বলি ... আমি অন্ধ , মোর মনের অন্ধতার জন্য...কিন্তু সমাজটা যাতে অন্ধ না হয় ... স্যর কি হল স্যর ...ইক্কেরে চুপ মেইরে গেলেন ...

স্যরঃ গুনধর তুই...(বলে কেঁদে ফেলে)

গুনঃ ছি ছি স্যর ... আমার অন্ধ হয়ার একটা ভালো আজ হল , যে বিপুল স্যরের চখের জল আমাকে . দিখতে হল না..। চোখ মুছেন স্যর ...। এই যে আপনার টিশন এইসে গেছে ... মিনুদিদিকে আমার প্রনাম দিবেন ...আর এই যে আমার বই ...জানার কুনো সেশ নাই ...আপনার নাতির জন্য ... জানি ইংলিশ মিডীয়ামে পড়ে , তবু না পারলে আপনি পড়ে দিবেন ...। বইটা আমি লিখ্যেছি স্যর... রাইটার ছিল ..
স্যরঃ তুই চল আমার সাথে, আমার সাথে থাকবি তুই, তোকে আমি শিমুলবনীতেই নিয়ে যাবো ...বলব...দেখো আমাদের গ্রামের গর্বকে দুচোখ ভরে দেখো ।। সমাজের অন্ধকার ঘোচাতে গিয়ে নিজের জীবনটাই যার...

গুনঃ না স্যর, জীবনটা আমার আন্ধার হয় লাই স্যর, চোখের আলোটাই সব লয় ...চোখের দেখাটাই পুড়া দেখা হয় লা ...। ভিতরটা পরিস্কার না হল্যে দিখাটা সম্পুর্ন হয় কি? কাকে কি বুঝাই ...।নামেন স্যর...ট্রেন্টা ছেড়ে দিব্যে...
স্যরঃ তুই যাবি না , ফিরবি না গাঁয়ে ?

গুনঃ একা তো ফিরার কথা ছিলো না ... যদি ফিরি বউদিদিকে লিয়েই ফিরব ... একটু খুঁজে দিখবেন স্যর ... মুর যে সবাই কে বলার আছে ...বউদিদি ডাইন লয় ...ডাইন বল্যে কিছু ...।।
(স্যর নেমে যান)...
(আগের মত বলতে থাকে) সুনুন দাদা ... আপনাদের কারো পেটখারাপ, মাথা ব্যথা, বাতের ব্যথা ...তো তাবিজ, কবচ, বাবা, মাদুলি ইসবে বিশ্বাস করবেন না ,...ডাক্তার দিখ্যান ...বিজ্ঞানে বিশ্বাস করুন

(কয়েকজন তাবিজ আর মাদুলি বিক্রেতা ঘিরে ধরে)

১: চোপ সালা, বিজ্ঞান মারাচ্ছো ...
২: তোমার জন্য সালা ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এ লাইনে ...
৩: ট্রেনে সালা কেউ এখন এসব কিনতেই চায় না ...মার সালা কে ...(ওরা ওকে মারতে থাকে, ও বলতেই থাকে, সবার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে voice over এ গুনধরের কণ্ঠ)
গুনঃ তোমরা পুড়ীয়ে মারতে পারো আমাকে, মুছে দিতে পারো আমার দৃষ্টি , ... কিন্তু আমি বলবই বিজ্ঞান শাশ্বত অমোঘ , অব্যর্থ, ... জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত পর্যন্ত আমি বলে যাবো পৃথিবী নয় সূর্যই স্থির ও সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ...।
পৃথিবী সুর্যের চারদিকে ঘুরছে ...।।
ঘুরবে... তোমরা বললেও ঘুরবে, না বললেও ...
পৃথিবী ঘুরবেই ... ।।

(পর্দা পড়ে)

****

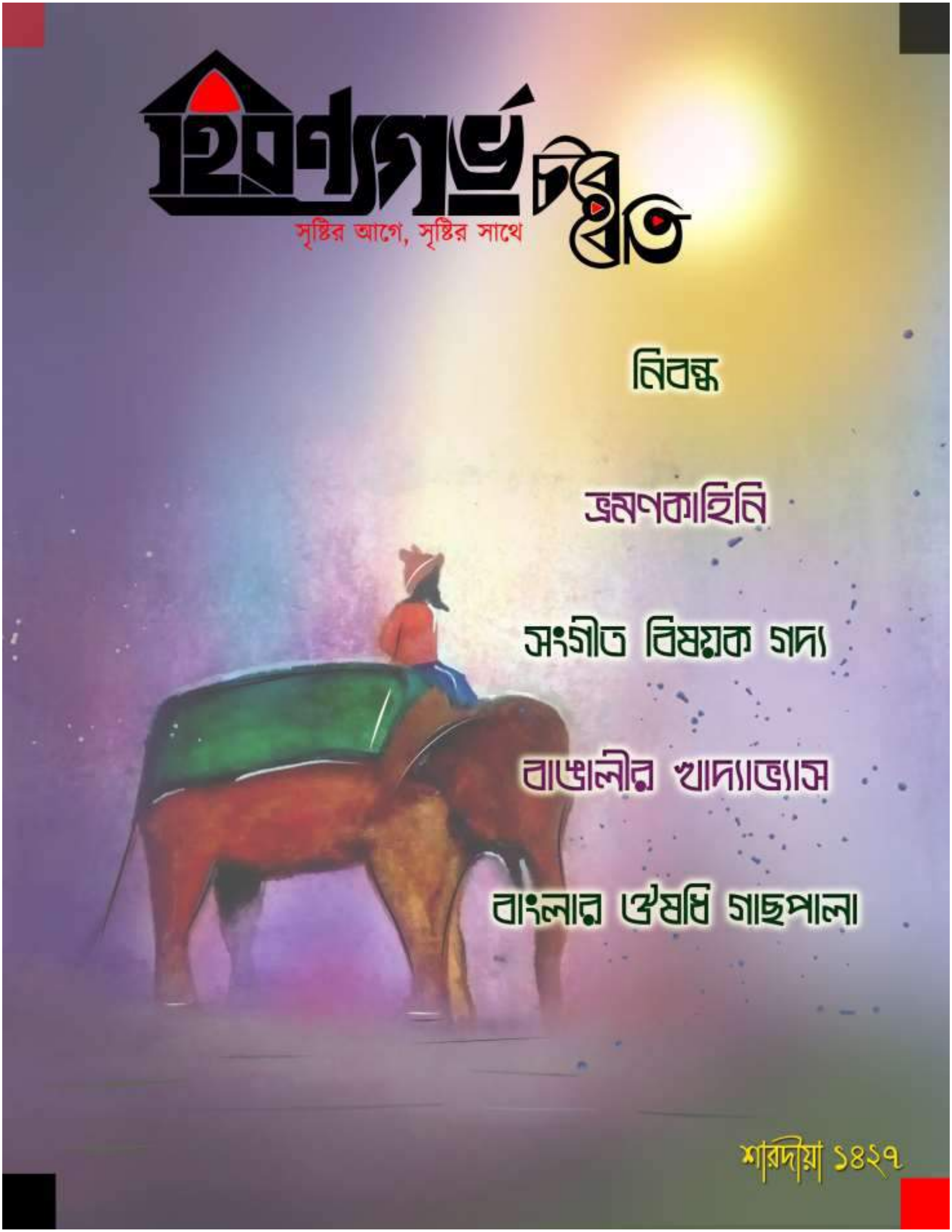
হিরণ্যগর্ভ
সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে
নিবন্ধ
ভ্রমণকাহিনি
সংগীত বিষয়ক গদ্য
বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস
বাংলার ঔষধি গাছপালা
শারদীয়া ১৪২৭

একটু অন্য দার্জিলিং

শৌভিক রায়

অত্যন্ত পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র দার্জিলিঙের কথা আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি জানি। উত্তর আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল বিস্তার, হিমালয়ের বুকে রডড্রেনডন আর ফরগেট মি নটের বাহার, পাহাড়ি ঝোরা, তরঙ্গায়িত সবুজ চা-বাগান, টয় ট্রেনের আঁকাবাঁকা চলা...সব মিলে দার্জিলিং কিন্তু সত্যিই জমজমাট। পর্যটন মানচিত্রে আজকের দার্জিলিং লামাহাটা, লেপচা জগত, তিনচুলে বা সন্দকফু ইত্যাদি নিয়ে চিত্রায়িত হলেও, খোদ দার্জিলিঙে এমন কয়েকটি দ্রষ্টব্য আছে যা দার্জিলিঙকে একটু অন্যভাবে চিনতে ও এখানকার ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করে।

প্রথমেই বলি ম্যাল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে একটি বাড়ির কথা। সি আর দাস রোডে পাহাড়ের গায়ে, পথের পাশে এই সুন্দর বাড়িটির নাম 'Step Aside'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম সার্ধশতবর্ষের এই বছরে এই বাড়িটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বরাজ পার্টি, জীবিকা ও সমাজসেবার অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চাপে ১৯২৫ সালের শুরু থেকে দেশবন্ধুর শরীর খারাপ হতে থাকে। চিকিৎসকদের পরামর্শে ও পারিবারিক আলোচনায় ঠিক হয় যে, দার্জিলিঙ 'চেঞ্জ'-এ যাওয়ার জন্য উপুযুক্ত জায়গা। ইতিমধ্যে দেশবন্ধুর পারিবারিক বন্ধু এন এন সরকার দার্জিলিঙে চৌরাস্তা বা ম্যালের খুব কাছে মিঃ বার্নসের একটি বাড়ি কিনেছিলেন। স্টেপ অ্যাসাইড' নামের এই বাড়িটি তৈরী হয়েছিল তার আগের শতকে। ১১ই মে, ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু স্ত্রী-কন্যা সহ কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে রওনা দেন। এন এন সরকারের নির্দেশে দার্জিলিঙে তাঁর প্রতিনিধি অনুপলাল গোস্বামী দেশবন্ধুকে বাড়িটিতে নিয়ে আসেন এবং তাঁর দেখভাল ও সুশ্রূষায় নিযুক্ত হন। 'স্টেপ অ্যাসাইড' নামের এই বাড়িটি কিন্তু ততদিনে সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে খানিকটা পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৯০৯ সালের ৮ই মে এই বাড়িতে পূর্ববঙ্গের সর্ববৃহৎ জমিদারির ভাওয়ালের অধিপতি রমেন্দ্রনারায়ণ রায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর শবদেহ দাহ করবার জন্য কাছের এক শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কোনো রহস্যময়ভাবে সেই দেহ নিখোঁজ হয়ে যায়। এই ঘটনার ১২ বছর পর অর্থাৎ ১৯২১ সাল নাগাদ ঢাকায় এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। তিনি নিজেকে রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে পরিচয় দেন। এরপর শুরু হয় আইনি লড়াই। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এই মামলা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা নামে খ্যাত যেখানে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭ সালে সন্ন্যাসীর জয় হয়। 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ যখন দেশবন্ধু আসেন তখন এই মামলা দানা বাঁধছে বলে এই বাড়িটির দিকে অনেকের নজর ছিল। দেশবন্ধুর আগমনে তা আরও গুরুত্ব পায়। ১৯২৫ সালে গান্ধীজি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিঙে আসেন। এটিই গান্ধীজির একমাত্র দার্জিলিঙে সফর। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং অবধি ৮০ কিমির পথে গান্ধীজি রিকশা ও গরুর গাড়ি ব্যবহার করলেও, অধিকাংশ সময় পায়ে হেঁটেই আসেন। দেশবন্ধু নিজে জানিয়েছেন যে, দার্জিলিং পাহাড়ের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য পায়ে হেঁটে ছাড়া উপভোগ করা যাবে না বুঝে গান্ধীজি পায়ে হাঁটবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জুন মাসের ৪ তারিখ থেকে ৯ তারিখ অবধি 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ দেশবন্ধু ও গান্ধীজির একসঙ্গে থাকা ও আলোচনা নিশ্চয়ই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই একই সময় অ্যানি বেসান্তও দেশবন্ধুর কাছে আসেন। সেই সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টি 'কমলওয়েলথ অফ ইন্ডিয়া বিল' আনবার প্রচেষ্টা করছিল। সেই সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অ্যানি বেসান্তের দার্জিলিঙে আগমন ও 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ পা রাখা প্রমান করে যে, এই বাড়িটি-সহ দার্জিলিং তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্য ঠিকানা হয়ে উঠেছিল। দার্জিলিঙের আবহাওয়ায় দেশবন্ধু খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি ও অ্যানি বেসান্ত ফিরে যাওয়ার পরে পরেই, ১৪ই জুন, তিনি হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র দুদিন পর অর্থাৎ ১৬ই জুন বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। দেশব্যাপী প্রবল শোকের মধ্যে তাঁর মরদেহ কলকাতায় আনা হয়। দেশবন্ধুর গুণমুগ্ধ শোকার্ত গান্ধীজি কলকাতায় ছুটে আসেন ও তাঁর অন্তিম যাত্রার নেতৃত্ব দেন। সবমিলে 'স্টেপ অ্যাসাইড' ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে।

আবার মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গড়ে ওঠা দার্জিলিঙের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা মহাত্মার জন্মের ১৫০ বছরে বোধহয় স্মরণ করা উচিত। এটি হল টিবেটান রিফিউজি সেলফ হেল্প সেন্টার। ১৯৫৯ সালের এপ্রিলে দলাই লামার তিব্বত ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। তারপরেই এই দেশে তিব্বতি শরণার্থীদের ঢল নেমেছিল। তেজপুরের নিকটবর্তী অরুণাচল প্রদেশের মিসামারি ও পশ্চিমবঙ্গের বক্সাদুয়ারে তাদের থাকবার জন্য শিবির করা হলেও ক্রমশ চাপ বাড়ছিল। তিব্বতি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৯০০০ পৌঁছলে তাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে উত্তর ভারতের জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পঙ ও দার্জিলিং ইত্যাদি জায়গায় পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই ভারতের দুর্দান্ত গরমে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।অন্যদিকে কম উচ্চতায় থাকবার জন্য নানা উপসর্গও দেখা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে। তাই শরণার্থী তিব্বতিদের ভারতের নানা প্রান্তে পাঠানোর সরকারি সিদ্ধান্তে সমর্থন ছিল প্রতিটি রাজনৈতিক দলের।দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে সেন্টার গড়ে তুলবার জন্য লেবঙের পশ্চিমে থাকা 'হার্মিটেজ' এলাকার

৩.৪৪ একর জমি লিজ নেওয়া হয়েছিল সেন্ট জোসেফ কলেজের কাছ থেকে। এই জায়গাটি মূল শহর থেকে খানিকটা দূরে হলেও যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়াও এই অঞ্চলে ত্রয়োদশ দলাই লামা ১৯১০ থেকে ১৯১২ সাল অবধি ছিলেন। তাই 'হিল সাইড' নামেও পরিচিত এই অঞ্চলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না। ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর এই সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে ছিলেন দু`জন পুরুষ ও দু`জন মহিলা। ক্রমে বেড়েছে (৩০০) তাদের সংখ্যা। বর্তমানে এই সংখ্যা ৭০০ ছুঁই ছুঁই। দার্জিলিং টিবেটান রিফুজি সেলফ হেল্প সেন্টারের মূল সুরটি হলো 'রং শো` বা নিজেকে সাহায্য। সেন্টারের বাসিন্দারা বুঝেছিলেন যে, অন্য রাষ্ট্রে শরণার্থী (৬০০) হয়ে থাকার গৌরবহীন জীবনে, 'পুনর্বাসন' শব্দটি তখনই যথাযথ হবে যদি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক ও মানসিকভাবে সাবলম্বী হয়ে ওঠা যায়। অনুদান, সাহায্য একটি পর্যায় পর্যন্ত জরুরি, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে এমন পথ নিতে হবে যেখানে শরণার্থী জীবনের কুণ্ঠা থাকবে না। সেদিনের সেই জেদ থেকে ক্রমশ ডানা মেলেছিল সেন্টার। ভাবতে ভালো লাগে এই অনমনীয় জেদের জন্য কোনো কোনো আর্থিক বছরে ৫০লক্ষ টাকারও বেশি তাদের তৈরী দ্রব্যাদি তারা বিক্রি করে থাকেন। তেনজিং নর্গে একসময় এই সেন্টারের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তেনজিং নর্গের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় দার্জিলিঙের আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা এবং সেটি হল হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন মাউন্টেনিয়ারিং এই সংস্থা ১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। তেনজিং নোরগের সাফল্যে উজ্জীবিত ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় দার্জিলিঙে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তেনজিংয়ের সাফল্যে এই দুই দিকপালের মনে হয়েছিল যে, নবীন প্রজন্মের মধ্যে যদি এই সাফল্যকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আখেরে দেশেরই হিতসাধন হবে। সেই উদ্দেশ্যেই দার্জিলিঙের লেবং রোডের রায় ভিলায় প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বাড়িটিতে সিস্টার নিবেদিতা কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে বার্চ হিলে, আজকের জায়গায়, প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বর্তমান দার্জিলিঙের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যে বিদেশী-সহ ৫০,০০০ অভিযাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত স্বয়ং তেনজিং দায়িত্ব সামলেছিলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত পর্বতারোহী নওয়াং গোম্বু, দর্জি লাটু, নিমা তাশি প্রমুখেরা নানাভাবে প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন। শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়, শেরপা প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ধরণের 'সুইস' শৈলীর বাড়ির পাশাপাশি রয়েছে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রদর্শনশালা যেখানে তেনজিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন অভিযাত্রীদের ব্যবহার করা পর্বতারোহণের সামগ্রী রক্ষিত। এটি দেশের মধ্যে পর্বতারোহণ বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন প্রদর্শনশালা।প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পর্বতারোহন তো বটেই, হিমালয়ের প্রকৃতি নিয়েও দুষ্প্রাপ্য বই নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগারটির সম্পদ। প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ তথা ভারতীয় পর্বতারোহণের প্রবাদপুরুষ নরেন্দ্র ধর জালালের নামে। উচ্চতায় ৫০ ফিট ও দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট দেওয়াল-সহ কাছের 'তেনজিং' ও 'গোম্বু রক'-এও চলে প্রশিক্ষণ। আটাশ দিনের প্রাথমিক কোর্সের সঙ্গে রয়েছে 'অ্যাডভান্স' কোর্স, 'রক ক্লাইম্বিং', 'ট্রেকিং' ও 'ওয়াটার স্পোর্টস'ও। এবাদেও দার্জিলিঙে নানা ধরণের সমাজসেবামূলক কাজে প্রতিষ্ঠানটির অংশগ্রহন তাকে আলাদা করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্লাইম্বিং ও মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের নয়নের মণি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে দেরি হয় নি প্রতিষ্ঠানের। তাই পর্যটকের সঙ্গে সঙ্গে অভিযাত্রী হতে ইচ্ছুক মানুষের ঢল নামে এখানে।

অন্যদিকে উচ্চতার বিচারে ভারতের সর্বোচ্চ বৃহত্তম ও উত্তরবঙ্গের প্রথম জুলজিকাল পার্ক বা চিড়িয়াখানাটি হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পাশেই অবস্থিত। ১৯৫৮ সালের ১৪ই অগাস্ট প্রতিষ্ঠার সময় হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক হিসেবে পরিচিত দার্জিলিঙের বার্চ হিলের এই চিড়িয়াখানা ১৯৭৫ নাম পাল্টে হয় পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ৭০০০ ফিট উচ্চতার এই পার্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে পার্কটিকে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এক্টের আওতায় এনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে এর ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেয়। ১৯৯৩ সালে সোসাইটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকেও পরিবেশ ও বন মন্ত্রক দায়িত্ব তুলে নেয়। কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে চলা পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক সমগ্র ভারতে অনন্য। এরকম পার্কের উদাহরণ সারা বিশ্বে অত্যন্ত কম। ১৯৬০ সালে এই পার্ক সবার নজর করেছিল যখন ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে ক্রুশ্চেভের উপহার দেওয়া দুটি সাইবেরিয়ান বাঘ এই পার্কে ঠাঁই পায়। সাইবেরিয়ার মতো অত্যন্ত ঠান্ডা অঞ্চলের প্রাণীকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক ছাড়া আর কারো কথা ভাবা যায় নি। দীর্ঘদিন সেই দুই সাইবেরিয়ান বাঘ ছিল এই পার্কের অন্যতম আকর্ষণ। আজকের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক তুষারচিতা-সহ একাধিক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবিস্তারে অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক তুষারচিতা ট্রাস্টের সভানেত্রী হেলেন ফ্রীম্যানের স্বপ্ন প্রকল্পে সাড়া দিয়ে, ১৯৮৩ সালে, প্রথম এশিয়ান চিড়িয়াখানা হিসেবে, পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক

তুষারচিতার 'স্পেসিস সারভাইভাল প্ল্যান'-এ অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালে জুরিখ থেকে আনা হয় দুই তুষারচিতা বিষ্ণু ও কাশি। তবে সাফল্য মেলে আমেরিকা থেকে আনা হাঙ্ক ও পার্শিয়া ১৯৮৯ সালে যখন যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। বিগত কুড়ি বছরে এই পার্কে ৪০টি তুষারচিতা শাবকের জন্ম নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ঘটনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আর কোনো পার্কে এরকম দৃষ্টান্ত নেই।

দার্জিলিঙের এই চারটি প্রতিষ্ঠান সারা ভারতের গর্বের বিষয়। তবে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ও পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে যত মানুষের ঢল নামে, দেশবন্ধুর বাড়ি বা তিব্বতী রিফিউজিদের সেন্টার দেখতে সেভাবে দর্শক আসেন না। তবে এই চারটি প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করে যে, দার্জিলিঙের মানসিকতা ও পরিবেশ আগাগোড়াই কসমোপলিটান। এই মিনি ভারতে কেবল নিজেদের দেশের মানুষেরা নন, পা রাখেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। এই চারটি প্রতিষ্ঠান দার্জিলিঙের একটি ছোট্ট পরিচয় মাত্র। দার্জিলিং আসলে লুকিয়ে কেভেন্টার্স, গ্লেনারিজ, বাতাসিয়া লুপ, লেবং, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঘুম মনাস্ট্রি, রেলওয়ে মিউজিয়াম, টাইগার হিল, বর্ধমান রাজার বাড়ি ইত্যাদি আরও অসংখ্য জায়গার মধ্যে। এই প্রত্যেকটি জায়গা ও বিষয় নিয়ে আলাদা করে লেখা যেতে পারে। আমাদের সবার তীব্র ভালবাসা ও অনুভূতির দার্জিলিং শুধুমাত্র 'রেনকোট টু ওভারকোট' নয়...বরং ছিপছিপে বৃষ্টি আর ঠান্ডা মেখে ঘুরে ঘুরে চিনে নিতে হয় দার্জিলিংকে।

****

ভ্রমণকাহিনি

তরিয়ুক

মহুয়া মজুমদার

পশ্চিম বাংলার উত্তর অংশ, যা উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, সেই উত্তরবঙ্গের মতো এমন অপার বৈচিত্র্যে ভরা ভূখণ্ড, যার সৌন্দর্য অতুলনীয় । নদী উপত্যকা এবং পার্বত্য অঞ্চলের শোভা, বৈচিত্র্যে ভরা অরণ্য, পার্বত্য জনজাতি ও নানা জনগোষ্ঠীর বর্ণময় উপস্থিতি উত্তরবঙ্গকে করে তুলেছে ভ্রমণ রসিকদের স্বর্গরাজ্য।

এই অপার সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে আমরা July এর শেষ দিকে বেড়িয়ে পড়লাম, সাথী হ'ল ঘণ বর্ষা ।

কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্নিবার হাতছানি, ঘুম ভাঙা সূর্যের চোখ মেলা পাহাড়, পাকদণ্ডি রাস্তা, ঝোরা আর সবুজে মাখা হিল্লোলিত চা বাগান- শতাব্দী প্রাচীন ধূপি বন ছুঁয়ে আমাদের আনন্দযাত্রা। এবারের গন্তব্য তরিয়ুক।

দার্জিলিং জেলার ছোট্ট এক পাহাড়ী গ্রাম। রওনা দিলাম চারজন মিলে। বর্ষাকে সাথী করে আমরা এগিয়ে চলেছি দার্জিলিং এর রাস্তায় Hill Cart Road ধরে। কার্শিয়াং ছেড়ে এগিয়ে চলেছি দিলারামের পথে। পাইন বন , সবুজ চা বাগান, উঁচু পাহাড় ও গভীর গিরিখাতকে সাথে নিয়ে চলতে চলতে গাড়ি দিলারামে পৌঁছে বাঁক নিলো ডান দিকে বাগোড়ার রাস্তায় । কিছু দুর যেতেই পাকদণ্ডি পাহাড় ক্রমশই উচ্চতা বাড়াতে লাগল। পাহাড়ী রাস্তার দুপাশের এক দিকে সবুজ পাহাড় ও আরেক দিকে শতাব্দী প্রাচীন কী তার-ও বেশি পুরোনো পাইন বন। July এর শেষ সপ্তাহেও যা ঘন কুয়াশায় মোড়া । কুয়াশার বুক চিরে পাইন বনের কোথাও কোথাও অতি হালকা দু'এক টুকরো রোদের মৃদু আভাস। মন যেন থমকে দাঁড়ায়, এই অপার্থিব সৌন্দর্যের স্বাদ নেবার জন্য ।

এগিয়ে চলেছি , সাথে চলেছে কখনো বৃষ্টি কখনো হালকা রোদের লুকোচুরি খেলা। নিস্তব্ধ ও জনহীন পিচ ঢালা রাস্তা । কপাল ভালো থাকলে এই রাস্তায় দেখা মিলতে পারে বুনো জন্তুর-ও। নিস্তব্ধ পাহাড় একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে পূর্ণ । এই পাহাড়ি রাস্তায় আর জঙ্গলে দেখা মেলে নানা ধরনের পাখির । এগিয়ে যেতে যেতে পাহাড়ের পট পরিবর্তন হল, পাহাড় জুড়ে হঠাৎ করে দেখা গেল ফার্ণের জঙ্গল। মনে হল ফার্ণের পাড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছি।
এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল পাহাড়ের মাঝে এক সুদৃশ্য গুম্ফার। সামান্য এগোতেই চোখে পড়ল আরেকটি গুম্ফা। একটিতে ধ্যান মগ্ন ভগবান বুদ্ধ ও অপরটিতে অবলোকিতেশ্বরের মনোরম মূর্তি । ভেতরের কারুকার্য ভারি সুন্দর । গুম্ফা দুটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশের দৃশ্য ভারি সুন্দর দেখা যায় । সামনের রাস্তায় পাহাড়ের গায়ে, সুন্দর করে যাতকের গল্প ছবিতে আঁকা । আর এই July এর বর্ষায় তরিয়ুক জুড়ে এক হাত পরপর নেমে এসেছে ঝরনা। মনোরম সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য ।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ।সে সারাদিনে কত রঙ পাল্টায়। সাদা , তামাটে কত রঙ। আর আছে সুগন্ধে ভরপুর এলাচ বাগান । আরো রয়েছে ন্যাশপাতি বাগান ও শীতের পরম পাওয়া কমলালেবু বাগানের শোভা।

ঘন জঙ্গল, ঝরণা আর মেঘ রোদের লুকোচুরি খেলা এক অন্য জগতে পৌঁছে দেয়। অরণ্যে ছাওয়া হিমালয়ের ছোট্ট এই জনপদ, জঙ্গলময় নীল সবুজ উপত্যকা, যার নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয় । শহরের কোলাহল মুক্ত, দূষণ মুক্ত এক শান্তির পরিবেশ। এই গ্রামের জনসংখ্যা বেশ কম। এখানে থাকার ব্যবস্থা বলতে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের বাড়ি, যা আমাদের কাছে "Home stay" নামে পরিচিত ।

এখান থেকে যাওয়া যায় মহলদিরাম, যেখানে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সবুজ চা বাগান ও shade tree। যতদূর চোখ যায় সবুজ গালিচা বিছানো, সাথে পাখির ডাকে মুখরিত । এখানে সবুজের কত যে বর্ণ বিন্যাস চোখে পড়ে তা বলে বোঝানো যাবে না । প্রকৃতি যেন তাঁর আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে চলেছেন অনবদ্য সৌন্দর্য, যা সারাটা দিন ধরে দেখলেও শেষ হয়না। সৌন্দর্য যেন ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টায় তার নিজস্বতায়। মন যেন প্রকৃতির মায়া জালে বুঁদ হয়ে থাকে ।

এখান থেকে সামান্য দুরে আছে অহলদাড়া view point। পাহাড়ের নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় । দেড় কিলোমিটার কাঁচা পাথুরে রাস্তা হেঁটে উঠতে হয় । রাস্তার মাঝে আছে এক নেপালী দিদির চা মোমো দোকান । এই রাস্তার শেষে মনে হয় পৃথিবীটা যেন হঠাৎ করে পায়ের নীচে চলে এসেছে । আর দূর থেকে দেখা যায় তিস্তা নদী জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে এসে মিশেছে একটি ছোট্ট নদীর সাথে । প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে কীভাবে সময় কেটে যায়, বোঝাই যায় না ।

এই পাহাড়ে আরো আছে পাইন গাছে ঘেরা নামথিং পোখরি। আর আছে পাহাড়ী উভচর salamander । যা ভারতে কেবলমাত্র এখানেই পাওয়া যায় । এখানকার অপর দ্রষ্টব্য দার্জিলিং জেলার প্রাচীনতম মাটির গুম্ফা।

সময় এগিয়ে গেল। পা বাড়ালাম ফেরার পথে । মনে থেকে যায় তরিয়ুকের উজ্জ্বল স্মৃতি ।

****

ভ্রমণকাহিনি

আমার চোখে বাঁকুড়া

তরুনার্ক লাহা

দুর্গাপুর থেকে বাস ছেড়ে দেয়। গন্তব্য বাঁকুড়া। আমার পাশের সীটে এক ভদ্রলোক। কথায় কথায় পরিচয় হলো। সুজন রক্ষিত। কলকাতা নিবাসী। আই.টি কোম্পানীতে কর্মরত। দিন কয়েকের ছুটিতে বাঁকুড়ার গ্রাম গঞ্জ ঘুরে দেখতে চায়। তার কথায়---কলকাতার ইঁট কাঠ পাথরের জঙ্গলে দম যেন আটকে যেতে চায়। ভাবলাম বাঁকুড়ার শাল মহুয়ার জঙ্গলের কিছুটা বিশুদ্ধ বাতাস নিয়ে নিই। পত্র পত্রিকায় বাঁকুড়া সম্পর্কে অনেক কথাই পড়েছি। ইচ্ছে হতো কলকাতার দম আটকানো পরিবেশ থেকে মুক্তি নিয়ে বাঁকুড়ার লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা দিয়ে দিশাহীণ ভাবে ঘুরতে থাকি। বলতে পারেন সেই ইচ্ছে পূরণের জন্যই বাঁকুড়াতে আসা।

আমাকে জিজ্ঞেস করে---আপনি তো বাঁকুড়ার মানুষ। আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই বাঁকুড়ার হালহকিকৎ।

সুজন রক্ষিতের বাঁকুড়া প্রীতি দেখে আমি বলতে শুরু করি----যদি বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে চলুন মুকুটমণিপুর। কাঁসাই আর কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে বাঁধ দেওয়া হয় ১৯৫৬ সালে। প্রতি বছর বর্ষার সময় কাঁসাই আর কুমারীর সে কি ভয়ঙ্কর রূপ। পার্শবর্তী এলাকা তখন জলের তলায়। ভিটে মাটি হারিয়ে মানুষ তখন উদবাস্ত। এই বাঁধ এখন মানুষের

কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। এক আমূল পরিবর্তন এসেছে মানুষের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে। বাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকাবেন—শুধু জল আর জল। নয়নাভিরাম দৃশ্য। সেই হাফপ্যান্ট বেলায় একবার পাড়ার লোকের সাথে মুকুটমণিপুরের বাঁধ দেখতে এসেছিলাম। আমার কাছে তা ছিল সমুদ্র দেখার সামিল। অথৈ জলের মাঝে একটা সবুজ দ্বীপ। হাতছানি দেয় বারবার। মন ভরে গিয়েছিল সেদিন। যেখানে কংসাবতী নদীতে জল ছাড়া হচ্ছে সেখানে কি ভয়ঙ্কর গর্জন। অবরুদ্ধ দৈত্য যেন ফুঁসছে। সেদিন ভেবেছিলাম এটা বুঝি জলপ্রপাত।

এই জলাধার থেকে অনেক খাল,ক্যানেল কাটা হয়েছে। এই কর্তিত পথ দিয়ে জলাধারের জল বাঁকুড়া ছেড়েও ছুটে গিয়েছে পার্শবর্তী জেলায়। বাঁকুড়ার রুখাশুখা মাটতে বসবাসকারি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এই জলাধার। আগে মানুষ চাতকের মতো তাকিয়ে থাকত একফোঁটা বৃষ্টির জন্য। এখন সারা বছর চাষীরা কিছু না কিছু ফসল ফলাচ্ছেই। এই জলাধারই বদলে দিয়েছে মানুষের জীবনধারা।

শীতের সময়ে মুকুটমণিপুরের চেহারা পুরোপুরি পালটে যায়। হৈ হৈ করে লোকজন আসে পিকনিক করতে। নৌকাবিহার,ডিয়ার পার্ক,ছোটখাটো মেলা-সব মিলিয়ে জমজমাট মুকুটমণিপুর। কেউ কেউ ঘুরতে ঘুরতে পাশের গ্রাম অম্বিকানগরে বেড়াতে যায়। দেবী অম্বিকার দর্শন হয়ে যায় সেই সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি অনেক প্রান্তিক মানুষের রুটিরোজগারের ভিত্তিভূমি এই মুকুটমণিপুর।

আপনি রাণিবাঁধ, ঝিলিমিলিও যেতে পারেন। চড়াই উৎরাই পথ। শাল মহুয়ার জঙ্গলের বুক চিরে দিশাহীণ রাস্তা। অনাবিল বিশুদ্ধ বাতাস। ফুরফুরে হাওয়াতে মনের সব জং ঝরে যাবে। পাশেই রয়েছে সুতান। প্রকৃতি এখানে সাজিয়েছে নিজের মতো করে। অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য। গভীর রাতে সুতানের বনবাংলো থেকে অজানা জীবজন্তুর ডাক শুনতে পাওয়া আর গা ছমছমে অনুভুতি-বাড়তি পাওনা বলতে পারেন।

আমি বলে যাই---বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে শুশুনিয়া পাহাড়। ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ বিশেষ। বাসে বা ট্রেনে ছাতনা যান। দেখতে পাবেন

ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো শুশুনিয়া পাহাড়কে। সকালে সূর্যস্নাত সবুজে ঢাকা এই পাহাড়িয়া দৃশ্য অপূর্ব। এই পাহাড়ের কোলে আর্টিজিও কূপ আছে। শীত গ্রীষ্ম,বর্ষা- এলাকার মানুষ এখান থেকেই বিশুদ্ধ জল নিয়ে যায়। লোকে বলে বাঘমুখের জল। কূপের মুখে একটা বাঘমুখ করা আছে তাই। শীতের সময় শুশুনিয়ার কোল ঘেঁসে পিকনিকের ধুম পড়ে যায়। এলাকার প্রান্তিক মানুষজন এই কটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে। আর

একটা বিষয় লক্ষণীয়। পাহাড়ের নীচে অনেক ছোটখাটো দোকান দেখতে পাবেন। অনেক শিল্পী পাথর খোদাই করে নানা রকমের ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করে। পয়সা থাকলে কেনার শেষ থাকে না। অনবদ্য সব শিল্প কর্ম। একরতি পাথরের উপর দেবী দুর্গার মুর্তি-ভাবা যায়?

ফেরার সময় একবার ছাতনাতেও নামতে পারেন। একানেই শ্রী কৃষ্ণকীর্তণ কাব্যের স্রষ্ঠা বড়ুচন্ডিদাসের জন্মস্থান। আসার সময় ছাতনার দোকান থেকে জিভে জল আসা প্যাড়া নিতে ভুলবেন না।
সুজন রক্ষিত জিজ্ঞেস করে---এবার কোথায় যাব বলুন।
আমি বলি---এবার বিষ্ণুপুরে যাওয়া যাক। ঐতিহাসিক শহর। চোখে পড়বে অনেক মন্দির। তিনতিনটে টেরাকোটার মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বিষ্ণুপুরের শিল্প ভাস্কর্য জানতে এই মন্দির গুলো খুব সাহায্য করে। তাছাড়া ছিন্নমস্তার মন্দির দর্শন করতে অনেকে যায়। দলমাদলের নাম শুনেছেন?কামান। বর্গী দমনের জন্য এই কামান আনা হয়েছিল। দলমাদল সেই ইতিহাস বুকে নিয়ে এখনো সাক্ষী হয়ে শুয়ে আছে।
ইচ্ছে হলে লালবাঁধও দেখতে যেতে পারেন। কথিত-মল্লরাজা রঘুনাথ লালবাঈ এর প্রেমে পড়েন। রাজার ইচ্ছে লালবাঈকে সাথে নিয়ে নৌকাবিহার করবেন। তিনি বিশাল এক পুস্করিনী খনন করান। তারপর ঈপ্সিত সেই অভিসার। পূর্ণিমার রাতে লালবাঈএর সাথে ব্যাভিচারী
রাজার নৌকাবিহার। জোছনা রাতে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়ালে মানস চক্ষে দেখতে পাবেন সেই পরকীয়া প্রেমের খন্ড ইতিহাস।
আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই। শাস্ত্রীয় সংগীতের যুগপুরুষ যদুভট্টের জন্মস্থান কিন্তু এই বিষ্ণুপুরেই। আরো ইতিহাস হয়তো জড়িয়ে আছে। বিষ্ণুপুরের আনাচে কানাচে কান পাতলেই সে সব শুনতে পাবেন।

ফেরার পথে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের স্বশুরবাড়ি জয়রামবাটিতে একবার উঁকি মেরে আসবেন। হয়তো মা সারদা এখন জীবিত নেই কিন্তু মায়ের জন্মস্থান ও তার লীলাক্ষেত্র এখনো আপনার মনে অনাবিল শান্তির স্পর্শ নিয়ে আসবে। সেই কুঁড়েঘর,সেই নিকানো উঠোন। আর নাই বা বললাম।

সুজন জানতে চায় — পাঁচমুড়ার কথা খবরের কাগজে পড়েছি। সেই বিষয়ে যদি কিছু আলোকপাত করেন।

আমি পাঁচমুড়া সম্পর্কে একটা খন্ডচিত্র সুজনের সামনে রাখি --- বাঁকুড়ার পূর্বপ্রান্তে একটা ছোট্ট জনপদ। আগে ছিল আর পাঁচটা গ্রামের মতোই পাড়াগ্রাম। এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বেশ উন্নত পাঁচমুড়া। স্কুল,কলেজ কতো কি গড়ে উঠেছে। বাইরের মানুষের কাছে এখানের আকর্ষণ পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। পোড়ামাটির ঘোড়া,হাতি,মনসা মুর্তি,হনুমানের গন্ধমাদন বহন কতো কি। এখানের কুমোরদের হাতের জাদুতে তৈরি জিনিসপত্র দেশ বিদেশে প্রশংসিত। জ্যান্ত ঘোড়া তো পুষতে পারি না,পারলে একটা পোড়ামাটির ঘোড়াই না হয় ঘরে নিয়ে যাবেন?

আরো অনেক জায়গা আছে যেগুলো একবার অন্তত ঘুরে আসা দরকার। বাঁকুড়াকে চিনতে এগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেখতে দেখতে বাস চলে এসেছে বাঁকুড়ার বাসস্ট্যান্ডে। নামার আগে বলি--- যদি পারেন বসন্তের সময় একবার আসবেন। রাস্তার ধারে ধারে লাল পলাশের বাহার দেখে আপনি ভুলে যাবেন আপনার সাজোয়া কলকাতার কথা। ভাববেন পারিজাত বুঝি খুব দূরে নয়।

****

স্বপ্নের থামগাড়া

শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার

এতদিন শিলিগুড়ি থেকে তিস্তা নদীর ওপর করোনেশন ব্রীজের ডানদিকের অংশ প্রায় চষে ফেলেছি। আবার কালিম্পং বা গ্যাংটকের রাস্তায় কতবার গেছি সেই সংখ্যাটা অসীম। তাই এবারে "করোনা" আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম কালিঝোড়া পার হয়ে বাঁ দিকে চলতে। যদি কোনো থাকার জায়গা পাই তো ভালো, না হলে শিলিগুড়ি ফিরে আসবো। প্রথমে পাইন বন, এরপর শালের জঙ্গল, শেষে চাবাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল "গুরুং হোম স্টে"। গাড়ি থামিয়ে ভিতরে ঢুকে জানতে চাইলাম -রাত বিতাউনু কো ঘর মিল ছ ?

উত্তর পেলাম - হাজুর।

খানা মিল ছ?

একই উত্তর- হাজুর।

ফুড র লজিং লিয়ের এক জনাকো একদিন আট'শ রুপিয়া লাগ ছ।

পরিবারের সবাই এক কথায় রাজী। পুবদিকে জানলা ও ব্যালকনি সহ দু খানা ঘর নেওয়া হ'ল। জানলা দিয়ে পাহাড় আর রঙ বেরঙের পাখীর ওড়াউড়ি। বর্ষা স্নাত জঙ্গলের রূপ যেন বাধ মানছে না। বাড়ির মালিক জানালেন গ্রামে মোটে কুড়িটি পরিবারের বাস। ছোট- বড় মিলিয়ে মোট লোক সংখ্যা একশোর একটু বেশী। আর যে অবিশ্বাস্য কথাটা শুনলাম- তা হ'ল ওখানে কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় নি।

ইতিমধ্যে ঘাসের উপর চেয়ার টেবিল পেতে দিয়েছেন গুরুংজী , এই বাড়ির মালিক তথা স্থানীয় চা বাগানের কর্মী। নাম কমল গুরুং। চেয়ারে বসতে না বসতেই চলে এল সুস্বাদু গরম চা। চা-য় চুমুক দিয়েই বুঝলাম এই চায়ের জাত আলাদা। ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পিছন দিকে যেতেই চোখে পড়ল বিশাল বাগান। যার একদিকে ফুল ও অন্যদিকে নানা ধরনের তরি তরকারি। জানা গেল সবই জৈব সারে উৎপন্ন। গুরুংজীর সাথে ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন গুরুংজীর মা ও স্ত্রী। ওঁর মা বললেন ছেলে কমল এই ব্যবসা শুরু করেছে। এই গ্রামে এই একটাই হোমস্টে। দোতলা বাড়ির উপর তলায় চারটে ঘরে জনা বারো লোক থাকতে পারে। ওঁর মায়ের কাছে জানতে চাইলাম এস্তো রামরো চায় কাঁ বাটো মিলেয়ঁ? ভদ্র মহিলা যা বললেন- তা এই রকম- এই চা পাতা মেশিনে শুকোনো বা ভাজা হয়নি। হাতের তালুতে ঘোষে এই চা তৈরী। এর নাম "হাত মলাই চায়ে"। তাই চায়ের স্বাদ ও গন্ধ একেবারে অপরিবর্তিত। আর এই চায়ে মেশানো হয়েছে বাড়ীতে পোষা গোরুর ঘন আর খাঁটি দুধ। সকালে জল খাবার খেয়ে বের হয়েছি। তাই ওদের বললাম - একেবারে দুপুরের খাবার খাবো। দুপুরে খেলাম ভাত, স্যালাড, ডাল, আলু -বরবটি ভাজা, কোয়াশ শাক ও ডিমের ঝোল। আলু ও পেঁয়াজ বাদে সবকিছুই বাড়ির, এমনি ডিমটা পর্যন্ত। আমাদের হাতে সময় দুই রাত তিন দিন। তাই বিকেলেই চলে গেলাম লাটপাংচার ও লাটকোঠি।

পরের দিন সকালে রুটি-আলুর দম খেয়ে চলে গেলাম লাব্দা বস্তি, রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত মংপু সাথে সিংকোনা প্রসেসিং কেন্দ্র ও অর্কিডের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র রংভি দেখতে। রংভিতে একটি ভিউ পয়েন্ট আছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে তিস্তার বয়ে চলা সঙ্গে বিভিন্ন ঝোরার আল্পনা এক সুন্দর চিত্রকল্প। সাথে বড়বড় নাম না জানা বৃক্ষে ধনেশ পাখীর ঘর গেরস্থালি। আপনাকে মুগ্ধ করবেই। সন্ধ্যে বেলায় দুরের পাহাড়ি বাড়ি থেকে ছিটকে পড়া আলোর বিন্দু আর জোনাকী পোকার চঞ্চল আলো এক মায়াজাল সৃষ্টি করে। সেপ্টেম্বর মাসেও রাতের শীতল বাতাস কম্বলের তলায় ঢুকতে বাধ্য করবেই। আর শীতলতা উপভোগ করতে চাইলে ঘরের জানালা এমনি কি দরজাও খুলে রাখতে পারেন। কোনো ভয় নেই। বন্য জন্তু- চিতাবাঘ, বনবিড়াল বা বেজী এসে পড়লে গুরুজীদের পোষা কুকুর সবটা সামনে নেবে। নিশ্চিন্তে আট ঘন্টার ঘুমে পৌঁছে যাবেন এক স্বপ্নরা দেশে। ঘুম ভাঙবে এক বুক নতুন আশা নিয়ে। আর এই গ্রামে মানে থামগাড়ায় সবাই গুরুং সম্প্রদায়ভুক্ত। বিশেষ পর্ব দিনে এলে সাক্ষী হতে পারবেন এদের লোকাচার বা সংস্কৃতির। যে সময়েই আসুন না কেন অবশ্যই পা ঢাকা জুতো পরবেন আর প্রয়োজনীয় ওষুধ আনতে ভুলবেন না।

এই গ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থানীয় ভাবে এখানে কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না আর অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিক গত আশি বছরে কোনো অভিযোগ কার্শিয়াং থানায় জমা পড়ে নি। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে আসাই ভালো তবে ওদের বললে ওরাও গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ এদের কোনো বিজ্ঞাপন নেই। অপার সবুজ প্রকৃতি আর সহজ সরল মানুষ গুলো নিজেরাই এঁদের বিজ্ঞাপন।

****

ভ্রমণকাহিনি

বিপুল সম্পদের বিষ্ণুপুর

সত্যম ভট্টাচার্য

শীতকালের বেলার একটা আলাদা মাধুর্য আছে। অনেক পরিশ্রমের পরও সেখানে মনের ফূর্তিতে কোন ভাটা পড়ে না। রোদ থাকে অথচ গায়ে তাপ লাগে না। ফুরফুরে হাওয়া দেয়। মনও তাই যেন বেশ খানিকটা ফুরফুরেই হয়ে থাকে। আর ঘোরাঘুরি মানে তো এক মুঠো সোনা রোদ যা জানালা খুললেই ঝাপিয়ে পড়ে ঘরের ভেতর আর মন ভালো হয়ে যায়।

ঠিক সেরকমই এক দুপুরে বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজের জানালাটা খুলতেই যখন দূরে রাসমঞ্চ দেখতে পেলাম মনটা যেন কেমন হয়ে গেলো। মল্লরাজাদের এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা ইতিহাস অনুযায়ী ৭০০ বা ১০০০ খ্রীস্টাব্দ যে সময়েই হয়ে থাকুক না কেন এ শহর বাঙলার এক অন্যতম ঐতিহাসিক স্থল। এর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে ইতিহাস। আছে টেরাকোটার এমন সমস্ত কাজ যা নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় এ কিভাবে সম্ভব?

যাই হোক হয়তো সবই সম্ভব। যেভাবে কোনকিছু না ঠিক থেকেই সেই শীতের দুপুরে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমে আর ট্যুরিস্ট লজে ব্যাগ রেখে আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম। যোগাযোগের সুবিধার জন্য বিষ্ণুপুরে থাকার সব থেকে ভালো জায়গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট লজ। পুজোর ঠিক পরেই হওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনভাবে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম,তবে বুকিং করে আসাই ভালো। আশেপাশেও প্রচুর লজ আছে। আর শুধু বিষ্ণুপুর ঘুরতে চাইলে লজের সামনেই প্রচুর ব্যাটারীচালিত রিক্সা পাওয়া যায়। গায়ে রোদ মেখে সেগুলোতে চেপে বেরিয়ে পরলেই হল। তারপর তো অলিতেগলিতে একটা অসম্ভব ঐতিহাসিক বিকেল। যারা ইতিহাস ভালোবাসেন,ভালোবাসেন কয়েকশো বছর পেরিয়ে অতীতের অলিন্দে কান রাখতে বিষ্ণুপুর তাদেরকে নিরাশ করবে না। ইতিহাস অনুযায়ী ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা প্রথম রঘুনাথের হাত ধরে মল্লবংশের এই রাজধানী বিষ্ণুপুরের পত্তন। আগে এর নাম ছিলো বন বিষ্ণুপুর। পরবর্তীতে আনুমানিক ষোলোশো বা সতেরোশো খ্রীস্টাব্দে এই রাজবংশ উন্নতির শিখরে পৌঁছয়।

আরো সকলের মতোই আমাদেরও বিষ্ণুপুর ভ্রমণ শুরু হল রাসমঞ্চ দিয়েই। অদ্ভূত আকৃতির এই সৌধটির উপরের দিকটি পিরামিডের মতো। মাঝখানটি অতীত বাঙলার চালার মতো,আবার খিলানগুলি মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করছে। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মল্লরাজ বীরহাম্বির। এই রাসমঞ্চে সে বছর থেকেই ১৯৩২ সাল অব্দি টানা রাস উতসব পালিত হয়েছে। মাকরা পাথর এবং ইঁটের তৈরি এই ইমারতটির চারপাশের সুন্দর বাগানে হাতে সময় থাকলে বেশ একটু বেরিয়েও নেওয়া যায়।

আসলে ভ্রমণ মানে তো অবসর যাপন। ভ্রমণ মানে ইঁট কাঠ পাথরের শহর থেকে বেরিয়ে অক্সিজেন নিয়ে ফেরা। দৈনিক আমাদের কর্মব্যস্ততা যে যন্ত্রে আমাদের পরিণত করছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। যদিও এখন বিভিন্ন কারণে আমরা ঘুরতে গেলে দৌড়তে থাকি,কিন্তু এরকম একটি ঐতিহাসিক শহরে এসে তা না করাই ভালো। তাহলে এর মজা বা চার্ম ঠিক আসবে না।

রাসমঞ্চ দেখে অলিগলি দিয়ে আমরা চললাম পাঁচচূড়ার শ্যামরায় মন্দির দেখতে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সাথে অনেক মিল থাকা এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের অবশ্য দ্রষ্টব্য। কারণ এর টেরাকোটার কাজ ঘন্টার পর ঘন্টা দেখেও শেষ করা যায় না। কত দেখবো। এক একটি জায়গাতে এক একটি ঘটনার বর্ণনা। কোথাও রামায়ণ-মহাভারত কোথাও রাসলীলার অনুপম সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখতে দেখতে মনে হয় আমরা কেন এসব ছেড়ে বাইরে স্থাপত্য দেখতে যাই। এ সমস্ত মন্দিরই বাঙলার সোনালী অতীতের সাক্ষ্য আজও বুকে বহন করছে। জানা যায় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাস্তার পাশেই দেখতে পেলাম গুমঘর। তবে অনেকে একে গুমঘর বললেও আবার অনেকেই একে সে সময়ের শস্যাধার বা জলের ট্যাঙ্কও

বলেন। তবে তা তেমন কিছু নয়। চলতে চলতেই দেখে নেওয়া যায় এমন।

এবারে আমরা পৌঁছলাম জোড়বাংলো মন্দিরে। বাঙলার পরম্পরাগত ঐতিহ্যের দুটি দোচালা কুটির একটি চারচালা শিখরের মাধ্যমে এখানে যুক্ত হয়েছে। আর সেকারণেই হয়তো এর নাম জোড় বাংলা। এটিও

ভ্রমণকাহিনি

সত্যম ভট্টাচার্য

রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একে কৃষ্ণরায় মন্দিরও বলা হয়। এই মন্দিরের গায়েও পোড়া মাটির রামায়ণ মহাভারত বা সে সময়ের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যের অসাধারণ কাজ আছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে সামনে দেখি কয়েকজন মহিলা বাঁকুড়ার পোড়া মাটির বিভিন্ন সুন্দর কারুকাজ নিয়ে বসে আছেন। তার মধ্যে ঘোড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জোড়বাংলো দেখে আমরা চললাম রাধাশ্যাম মন্দিরে। এই মন্দিরটিতে এখোনো পুজো হয়। মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে মাকড়া পাথরের এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরটি কিন্তু বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরের থেকে আলাদা। এর চূড়াটি গম্বুজাকৃতি। এখানে একটি সুন্দর নহবতখানা ও মনকাড়া তুলসী মঞ্চ আছে। তুলসী মঞ্চটিতে ওড়িয়া স্থাপত্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকেই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মৃন্ময়ী মন্দির। কথিত আছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি এখানে দেবী দর্শন করতে এসেছিলেন।

শীতকালের সেই পড়ন্ত বেলায় এবারে আমরা দেখলাম একসময়ে এই মল্লভূমে ঢোকবার দুটি তোরণ। বড়টির নাম বড় পাথর দরজা ও ছোটোটির নাম ছোটো পাথর দরজা। মাকড়া পাথরের তৈরি দুটি দরজাই খুব সম্ভবত রাজা বীরসিংহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তোরণদুটিতে তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্যদের জন্য ছোট ছোট গর্ত করা আছে। ছোটো পাথর দরজার কাছে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তোপধ্বনি করা হয়। এর কাছাকাছিই রাধালালজীউ মন্দির। এই মন্দিরটির পরিসর অনেকটাই বড়। মল্লরাজ বীরসিংহ এটি ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এরপর আমরা এসে পৌছলাম দলমাদল কামানের সামনে যার প্রকৃত নাম না কি ছিলো দলমর্দন। শোনা যায় মল্লরাজাদের অসংখ্য কামান ছিলো। যার বেশীর ভাগই বৃটিশ সরকার সরিয়ে ফেলে। এই দলমাদল বা দলমর্দ্দন কামান থেকে গোলা ছুড়েই মল্লবাহিনী ভাস্কর রাও এর নেতৃত্বাধীন বর্গী বাহিনীকে বিতাড়ন করেছিলেন। এবারে দেখলাম ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নামছে। টোটোচালক বললেন দাদা লালবাঁধে চলুন। অচেনা জায়গাতে সারথীই ভরসা। গেলাম। রাজা রঘুনাথ সিংহের নর্তকী লালবাঈয়ের নাম অনুযায়ী এই জলাশয়ের নাম হয় লালবাঁধ।

লালমাটির পথ বেয়ে এবারে দেখতে চললাম রাধামাধব ও রাধাগোবিন্দ মন্দির। সূর্য তখন ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। কানে ফিসফিস করছে অতীত ইতিহাসের শব্দরা। এই দুটি মন্দিরের প্রথমটি মল্লরাজ গোপাল সিংহের পুত্রবধূ চূড়ামণিদেবী ও দ্বিতীয়টি পুত্র কৃষ্ণ সিংহের প্রতিষ্ঠা করা। মন্দির দুটি ঘুরে এসে নামলাম আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের বাইরে। এর কাছেই ট্যুরিস্টলজ। তাই রিক্সা ছেড়ে দেওয়া হল।

ভারতবর্ষে যতগুলি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরানা আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষ্ণুপুর ঘরানা। এটিই সমগ্র পূর্ব ভারতের একমাত্র ঘরানা। ইতিহাস বলে যে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাহাদুর খাঁ সাহেবকে তার দরবারে আসন প্রদান করেন। এবং তিনিই এই অঞ্চলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার ঘটান। তাই আপনি যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমঝদার হন তাহলে বিষ্ণুপুর আপনার সামনে তার ডালি উজাড় করে ধরবে। এবং বিষ্ণুপুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে চাইলে আসতেই হবে এই মিউজিয়ামে। বলা হয় যে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতসাধক যদুভট্টের কয়েকটি গানের সুর নিয়ে তার ভাঙাগানগুলি রচনা করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে তিনি এই ঘরানাকে আশ্রয় করেই সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলেন।

অদ্ভূত এক ঘোর নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসলাম। ভাবলাম এজন্যই তো কতদিন আগে শেক্সপীয়র বলেছিলেন-If music be the food of love, play on.এবারে যেতে হয় বিষ্ণুপুরের আরেক সম্পদ তার সিল্ক দেখতে। এক কথায় অসাধারণ। শিল্পকলা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না এমন। এক একটি শাড়ীতে এক একটি গল্প বর্ণিত হয়েছে। প্রণাম করতে ইচ্ছে করে এমন সব কারিগরদের যারা সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে আমাদের এমন শিল্পকর্ম উপহার দিয়ে যান।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। বাঁকুড়ায় আসবেন আর তার বিখ্যাত তেলেভাজা খাবেন না তা তো হতে পারে না। তাই তেলেভাজা খেতে খেতে ফিরে দেখলাম ট্যুরিস্ট লজের আলো জ্বলে উঠেছে। উতসবের

মরসুমে লজের ভেতরে লোকজনের ভিড়,কথাবার্তা, গল্প শুনে আমাদের সময় কেটে গেলো ভালোই। রাতে ঠিক হল পরদিন আমরা যাবো জয়রামবাটি এবং কামারপুকুর।

এখোনো মনে আছে সেই দিনটি ছিলো শনিবার। দুপুরের মধ্যে জয়রামবাটি কামারপুকুর ঘুরে এসে খেয়েদেয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়েই

চললাম বিষ্ণুপুরের শনিবারের হাট দেখতে। তিনটি মন্দির মিলে যে এখানে জোড়মন্দির আছে তার সামনের বিশাল মাঠেই এই হাট বসে। দেখলাম বোলপুরের অনুকরণে এখানে শনিবারের হাট চালু হলেও বাঁকুড়ার বিশাল শিল্প সংস্কৃতিকে জানতেই পারতাম না এখানে না এলে। হাটের একদিকে যেমন আদিবাসীরা মেতে উঠেছেন ধামসা মাদল নিয়ে তাদের নাচ গানে,আবার আরেকদিকে চলছে কীর্তন। আর গোটা হাট জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পোড়ামাটি বা টেরাকোটার কাজ। সেখানে যেমন আছে ঘর সাজানোর জিনিস, তেমনিই আবার আছে মহিলাদের অলঙ্কার। খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যে কাটিয়ে পায়ে হেঁটেই ট্যুরিস্ট লজে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম ঘরের সামনে এত মহার্ঘ জিনিস থাকতে কেন আমরা হিল্লি দিল্লী ছুটে বেড়াই।

লাল মাটির দেশ বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর তার সুমহান ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের সামনেই তো আছে। আছে অবিশ্বাস্য সব টেরাকোটার কাজ। আছে বিষ্ণুপুর ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুপম হাতছানি। তাই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে যে ঘরের পাশের শিশির বিন্দুটির মতো এসব স্থানকে ভুলে না থেকে, আসুন আমরা আমাদের ইতিহাসকে জানি, চিনি।

****

যোগাযোগ

লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর কলকাতা থেকে ১৫২ কিমি দূরে অবস্থিত। ট্রেন অথবা বাস যে কোনভাবে খুব সহজেই পৌঁছনো যায়। একের পর এক ট্রেন ছাড়ছে হাওড়া স্টেশন থেকে। বাসও সহজেই পাওয়া যায় ধর্মতলা থেকে।

বনঘেরী হোম স্টে: গ্রামের শেষ বাড়িটা

সেমন্তী মিত্র

বিগত ছয়মাস ধরে আমরা গৃহবন্দী, কোনো দুরারোগ্য রোগ হলে যেমনটা হয় তেমনি, আতঙ্কে-ভয়ে শিহরিত, প্রিয়জনের অনিষ্ট আশঙ্কায় চিন্তান্বিত, বিধ্বস্ত। জীবনকে সম্যক রূপে উপলব্ধি করা ভুলে যেতে বসেছি প্রায়। 'ডাকঘরের' অমলের মতো জীবনযাপন, তবুও তাঁর জীবনে একজন দইওয়ালা ছিল, ওই একরত্তি খোলা জানলার পাশে বসে সে পৃথিবীর সবটুকু রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য আস্বাদন করতে চেয়েছিল। আমরা বর্তমানে সামাজিক জীব হয়েও অসামাজিক, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং ও নানাবিধ সুরক্ষাবিধি মেনে চলেছি নিজেদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মন তো চলার বেগ থামায় না, স্মৃতিরা ঘুরে ফিরে ঠিক জমা হয় মনের এককোণে, তখনই আকাশ মেঘলা করে বৃষ্টি নামে, স্মৃতির ধারায় ভিজে যাই, সে এক অদ্ভুত ভালোলাগার আবেশ।

তখনও আমাদের ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা ছিল, মানুষে মানুষে করমর্দন করার চল ছিল, আলিঙ্গনে বাঁধতাম একে অপরকে, বাহবা দিতে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিতাম। সেরকমই একসময়, চৈত্রের দাবদাহে অতিষ্ট হয়ে, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে চললাম বনঘেরী হোম স্টে'র উদ্দেশ্যে, কৈখালী, সুন্দরবন।

শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে করে জয়নগর-মজিলপুর, সেখান থেকে অটো করে কৈখালী, হোম স্টে'র মালিক নীলাঞ্জন চক্রবর্তীর সাথে আগেই কথা হয়ে গেছিল। কলকাতা থেকে গাড়ি করেও সরাসরি হোম স্টে তে পৌঁছানো যায়, আবার যাঁদের গাড়ি নেই তাঁরা ট্রেনে করে জয়নগরে নেমে সেখান থেকে হোম স্টে'র পাঠানো অটোতে করে আসতে পারেন, সবমিলিয়ে ওই ঘণ্টা তিনেকের পথ।

নীলাঞ্জন বাবু ফোনে বললেন, "দুঃশাসন কে পাঠানো হয়েছে, ও আপনাদের অটোতে করে হোম স্টে'তে নিয়ে আসবে" আমার তো নাম শুনেই আক্কেল গুড়ুম! লম্বা, শীর্ণকায়, শ্যামবর্ণের হাসি হাসি মুখের একজন ব্যক্তি, দুঃশাসন। দুইঘণ্টা ট্রেনজার্নির পর জয়নগর থেকে অটোতে করে আরও ঘণ্টা দেড়-দুয়েকের পথ প্রায়, দুঃশাসন বলল যে মাস্ক পরে নিতে। না না ভাইরাস নয়, প্রচণ্ড ধুলো, তার কবল থেকে বাঁচার জন্য। পথে নিমপীঠ পড়লো, অটোয় বসে থেকেই আশ্রমটাকেএকঝলক দেখে নিয়ে চললাম কৈখালীর উদ্দেশ্যে। গাড়ি যত এগোয় তত কোলাহল, জনসমাগম, বাজার, পাকা রাস্তা সব ফুরোতে থাকে, গাছপালা, ধানক্ষেত, মাটির ঘর, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, লাঙল, গরুর পাল- কে বলবে কলকাতার থেকে ঘণ্টা তিনেকের দূরত্বে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন এমন সুন্দর প্রকৃতির কোলে- মাটির কাছাকাছি। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা দিয়ে অটো ভটভট করতে করতে হেলেদুলে পৌঁছে গেল বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি গেটের সামনে, খড়ের ছাউনি, ইটের পিলার, লেখা আছে "BONGHERI HOMESTAY, SUNDARBAN" সূর্য তখন মধ্যগগনে, আশপাশটা একঝলক দেখে মনে হল কেউ যেন সবুজ রঙের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে।

দরজা সরিয়ে ঢুকলাম হোম স্টে তে, অপূর্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ক্যাম্পাস, দু তিনটে খড়ের ছাউনি দেওয়া চারপাশ উন্মুক্ত ছোটছোট মাটির ঘর, সামনেই স্বচ্ছ জলাশয়, তাতে শালুক-পদ্ম, তিন চারটে হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছে, অনতিদূরে খাঁচায় টিয়া পাখি, নানবিধ ফুল, ঘাস, ফড়িং, দোলনা সবমিলিয়ে শান্তির নীড়। ডাবের জল দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা হল, বসলাম ওই একটি মাটির ঘরে, ততক্ষণে আর গরম লাগছে না, হাওয়া এসে এসে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন, চুলগুলো অবাধ্য। নীলাঞ্জন বাবু এলেন, বললেন, "এটাই গ্রামের শেষ বাড়ি, পাশেই মাতলা" কান পাতলাম, ক্ষীণ জলের আওয়াজ, গোলপাতার ম্যানগ্রোভ গাছ গুলো হোম স্টে থেকেই দেখা যায়, নদী জঙ্গলের ওপারে লুকিয়ে আছে, গাছের সারি সরালেই যেন বলবে ধাপ্পা! এবার নজর গেল আমাদের থাকবার ঘরটিতে, ছোট্ট হোম স্টে, কেবল দুটি মাত্র ই থাকার ঘর,সাথে এটাচড বাথরুম, প্রকৃতির কোলে ওই একরত্তি অডম্যান আউট, শহুরে মানুষদের জন্য শহুরে ব্যবস্থা। মালিক বললেন, "এসি আছে, কিন্তু চালাবার দরকার পরে না"

ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে চললাম মধ্যাহ্ন ভোজনে। খাওয়ার স্থান টিও মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি, ছায়াময়, নরম-নরম ভেজা-ভেজা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। আমরা টেবিলে বসতেই দুজন দিদি এসে পরিবেশন করলেন, ভাত, লাল শাক ভাজা, সরু-সরু লম্বা-লম্বা আলু ভাজা, সোনা মুগের ডাল, কাতলার ঝোল আর চিংড়ির মালাইকারী, রাজকীয়! ধোঁয়া ওঠা মোটা মোটা চালের ভাত সহযোগে গ্রাম বাংলার রান্না, অপূর্ব লাগছিলো, আর তারসাথে অতিরিক্ত পাওনা ছিল আন্তরিকতা, সরলতা আর ভালবাসার পরশ, যা কোনো নামীদামী হোটেলেও হয়তো সেভাবে থাকে না। খাওয়া শেষে চললাম ঘরে বিশ্রাম নিতে, ঠিক হল পড়ন্ত বিকেলে বেরোবো মাতলা নদীকে

দেখতে। খাটে শুতে আরামে চোখ বুজে এলো।

ঘণ্টা খানেকের ভাতঘুম দিয়ে শরীর একদম ঝরঝরে লাগছে, ঘড়ির কাঁটা চারটে ছুঁইছুঁই, হোম স্টে থেকে বেরিয়ে মাটিরবাঁধের রাস্তা বরাবর গোলপাতার ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, কাদা-মাটির গন্ধ, পরিত্যক্ত নৌকা,

ছোটছোট মাটির বাড়ি, গাছ, মাছ ধরার জাল, বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করা গরু, ছাগলছানা, মুরগী, মানুষজনসব পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছলাম মন মাতাল করা নদী মাতলার সামনে, অদ্ভুত রকমের স্নিগ্ধ নীল রঙ, আর কি অপরূপ তার বিস্তার। নদী দেখে দেখেই মন ভরে গেল, কর্দমাক্ত তীরে দুটো নৌকা বাঁধা, যেন দুই বন্ধু। সন্ধ্যে নামার আগে আবার ফিরে চললাম হোম স্টে তে। অবশ্য পথে যেতে যেতে ধানক্ষেত চোখে পড়ল, মনোরম হরিদ্রাভের শোভা, মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়, ছোট ছোট জলাশয় গুলোতে সূর্য তখন লুকোচুরি খেলছে পদ্ম পাতার সাথে।

ফিরে গিয়েই চা, মুড়ি, আলুর চপ সহযোগে। অন্ধকার হতেই হাওয়ার তোড় বাড়ল, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কি উদ্দামতা, কোথায় লাগে ফ্যান এসি, মাঝখানে আলোও চলে গেল, তখন শুধুই গাছের পাতার শিরশিরানি আওয়াজ, জোনাকি, হাওয়া, মিটমিটে তারা আর আমরা, সে অপূর্ব অনুভূতি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। গরম গরম হাতরুটি চিকেন সহযোগে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সে রাতে, ঠিক হল পরদিন সকাল সকাল আবার মাতলা নদী দেখতে যাওয়া হবে।

গ্রামের শেষ বাড়িতে ভোরের আলো যেন খুব তাড়াতাড়ি এলো, গাছেদের নৃত্য, পাখির কূজন, হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক, টিয়ার বকবকে ঘুম ভেঙে গেল। মার্চ মাসের তীব্র দাবদাহে, অগ্নিবাণে কলকাতা যখন পুড়ছে, তখন এই সুন্দরবন-কৈখালী তে হাল্কা হিমেল স্পর্শ! অভাবনীয়, আর দূষণের লেশ মাত্র নেই। আবার ফ্রেশ হয়ে চললাম মাতলা নদী পানে। মাটির বাঁধ বরাবর আসতেই দেখলাম জেলেরা সব বসে আছে, জাল ভর্তি মাছ, জাল থেকে মাছ বেছে বেছে তোলা হচ্ছে। কাদা মাটির সোঁদা গন্ধ, মাছের গন্ধ, জেলেদের ঘামের গন্ধ, পাতার গন্ধ, নদীর জলের গন্ধ সব মিলেমিশে একাকার। সূর্যকিরণ নদীর জলে পড়ে চিকচিকে হীরের মতো লাগছে। বিকেলের নদীর একরকম রূপ আর সকালের সাজ অন্যরকম। কিন্তু রোদ একটু বাড়তেই গরম লাগতে শুরু করলো। না সেবার আমরা লঞ্চ ভাড়া করে মাতলা নদী বক্ষে গা ভাসাই নি, আসলে কোনোকিছু দেখবো এরকম লিস্ট তো সাথে করে নিয়ে যাই ই নি। ইচ্ছা ছিল প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটানোর, আর তার ভালবাসা-স্নেহ কে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করার।

হোম স্টে তে ফেরার পথে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটি মনে পড়ছিল,

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?"

সত্যি সোনার ফসলে সাজানো সোনার বাংলা, নানা রকমের নদনদী বিধৌত, তাকে ভালো না বেসে পারা যায় বলুন তো? ফিরে প্রাতরাশ ছিল লুচি আর সাদা আলুর তরকারি, এ যে সব বাঙালির ই খুব প্রিয় সেতো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমরা শহরের মানুষ, হাত পা বাঁধা, অবসর মেলাই দায়, তাও মার্চ মাসের ব্যস্ততায়, অগত্যা ফিরতেই হয়। রেডি হয়ে হোম স্টে র সামনে দাঁড়াতেই আবার দুঃশাসন এলো হাসিমুখে, রান্নার দিদিরা, হোম স্টে'র স্টাফ-মালিক সবাই বিদায় জানালেন, অটো ছুটল জয়নগর পানে, সেখান থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদহ আর সেখান থেকে বাড়ি।

পথে যেতে যেতেই ভাবছিলাম, আমরা যারা দক্ষিণবঙ্গে থাকি, গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহে অস্থির হই, দূষণ, মানুষের কোলাহল, গাড়ির হর্ন আমাদের সবসময় বিরক্ত করে তোলে, তাদের জন্য কৈখালী সুন্দরবনের এই মনোরম পরিবেশ একদম আদর্শ, ব্যস্ত জীবনের চলার ফাঁকে একটুখানি খোলা জানলা, বাতাসের নরম ছোঁয়া আর অক্সিজেন। যেতে যেতেই স্থির হল যে আমরা আবার এখানে আসবো, এবং মাতলা নদী ভ্রমণে বেরোবো। আর অদ্ভুত ভাললেগেছিল হোম স্টে'র আতিথেয়তা, আজকাল আর আত্মীয় পরিজনের বাড়ি যাওয়া হয় না, খাওয়ার সময় আদর মাখানো স্বরে কেউ যে বলবে, "আরেকটু নাও দিদিভাই" এও বড় বিরল। প্রকৃতির আমেজের সাথে সাথে আপ্যায়নের উষ্ণতাও তো মানুষকে টানে। জয়নগর আসতে চিন্তার অবসান হল।

সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই সুযোগ পেলেই, অথচ ঘরের কাছে এমন শান্তি আছে, তার কখনো খোঁজ ই নেওয়া হয় নি। কবিগুরু ছাড়া বাঙালির ভ্রমণ অসম্পূর্ণ, তাই তাঁর সৃষ্টি দিয়েই এ ভ্রমণের সমাপ্তি,

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শীষের উপরএকটি শিশির বিন্দু"

****

ভ্রমণকাহিনি

না-দেখা অথচ দেখা ভূগোলের অনুচ্চারিত অক্ষর

নীলাদ্রি দেব

আচ্ছা, স্বপ্নরাজ্য বলতে আপনি কী বোঝেন? স্বপ্নরাজ্য বলে আদৌ কি কিছু হয়? এর কি কোনো নির্ণায়ক মান আছে?

মডেল অঞ্চল আছে? শহর বা গ্রাম/ পাহাড় বা সমুদ্র/ জঙ্গল বা জনপদ? এমন সব প্রশ্ন আসলে অবান্তর। এর/ এদের নিজস্ব কোন উত্তরশৈলী থাকতে নেই। কিন্তু অদ্ভুত কিছু উত্তর উঠে আসে এমনই সব প্রশ্নের। আপনি হাঁটছেন। একবার থমকে দাঁড়ান। শুনুন। কিংবা শুনেই দাঁড়ান। অবাক হলে মুখের হাঁ 30 সেকেন্ডের বেশি সম্প্রসারিত অবস্থায় রাখতে নেই। এত ভূমিকারই বা কী আছে? আজগুবি মনে হলেও এটা সত্যি, যে অঞ্চলের কথা বলব, সেখানে আমার যাওয়া স্বপ্নেরই মত। লালমাটির গ্রাম। দুটো গ্রাম। পলসা আর পালিগ্রাম। অদ্ভুত এক মায়াঘোর বিছিয়ে

রেখেছে যেন! পলসা মিরিটির খুব কাছে। সাত কিলোমিটারের মত। বীরভূম বর্ধমান মুর্শিদাবাদের সীমানা। আর পালিগ্রাম। গুসকরা স্টেশনের পাশে। কাছেই অজয়। আশেপাশের পর্যটন কেন্দ্র বলতে বোলপুর। ওদিকটায় প্রায় সারাবছর টুরিস্টদের ভিড় হয়। কিন্তু এখানে টুরিস্টরা আসেন না। আসবেনই বা কেন? খালি চোখে তেমন কিছু নেই, কিছুই নেই। কুয়াশা মাখা চোখে এটা/ এগুলো কোন স্পটই না। দেখার মত জিনিস পেলে তো মানুষ আসবেন। তাহলে আমি হঠাৎ এ দুটো গ্রামের কথাই বা কেন বলছি? পর্যটন মানচিত্রে নিয়ে আসা? একদম নয়। মানচিত্রে এলেই ভেতরের স্বাদটা হারিয়ে যায় বলে আমার বিশ্বাস।

তবে, কেন কিংবা কেন নয়.... এত হিসেব করে ভ্রমণ বিভাগে লেখা শক্ত। যদিও ব্যাকরণ মেনে, শক্ত সহজ এর তুলনামূলক আলোচনা করে একটি শব্দও লিখব না এই গদ্যে। আপনারা যে দুটো গ্রামের সাথে আজ নামে পরিচিত হলেন, তাদের কাছে গিয়েই একমাত্র এর রস নেওয়া সম্ভব। যেতে হবে, আবার দিনে দিনে ফিরেও আসতে হবে। থাকার এখনও তেমন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু খুঁড়ে দেখতে চান জলতল, এমন মানুষেরা থাকার জায়গা করে নিতে পারেন নিজেরাই নিজেদের মতন করে। তবে এই পরিশ্রমের গল্প তখনই আসবে যখন এ দুটো জায়গার রসে মজে উঠবে বাকি গল্পটা।

গল্পটা এখান থেকেই শুরু হোক। না, আবার স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় নয়। কারণ যে কালেই যান না কেন, এ গ্রামগুলো কিংবা এখানকার মানুষজন অন্তহীন উদারতায় কাছে টেনে নেবে। নেবেই। প্রতিটি ঋতুতে এ অঞ্চলের, চারপাশের বদল চোখে পড়লেও প্রতিটি মুহূর্তের বদল হৃদয়ে গেঁথে নেবার মত। ফসলে ভরা একটি গ্রামের আকাশে এক পাল বক উড়ে গেল। মেঘ থেকে থেকেই কালো হয়ে এসেছে। দূরে তালবন। কাছে জমির পর জমি.... সবুজ ...শস্য...।

অন্য কোনো দৃশ্যে, তেতুল গাছের পাতায় শেষ বিকেলের রোদ খেলা করছে। পাখিরা ঘরে ফিরবে। মৃত কোনো কাঠে প্রায় হলদেটে ছত্রাক। চারপাশে অধিকাংশই মাটির বাড়ি। কোথাও আলপনা আঁকা মেঝেতে। কোথাওবা দেওয়ালে। চেনা-অচেনা ফুলের গন্ধ পেরিয়ে জলা জমি। কোনো বাড়ির দাওয়ায় শিলনোড়ায় রুই মাছের সাঁতার আঁকছেন কেউ। সমান্তরাল আল পথের পাশে উইঢিপি।

নিচু হয়ে দেখলে নিজেকে কত তুচ্ছ মনে হয়। এত এত অহংকার এর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে পুকুরের ধারে। হাঁসেরা জলে খেলছে। পুকুরের শেষে সবুজের সামান্য রেখা। এরপর বিরাট আকাশ। প্রকৃতি।

নির্ভেজাল প্রকৃতি চোখ/ মনের সমস্তটা জুড়ে। সন্ধের আগে রোদও ছড়িয়ে যায় মেঘের কার্নিশে কার্নিশে। পালিগ্রামের গুঁড়ো ইঁটের পথ, পাথুরে পথের বাঁকে বিরাট বটগাছ। ওর ডাল থেকে খসে যাচ্ছে পুরনো পোশাক। খসে যাচ্ছে পাখিদের ডাক ও ডাকপিওনের বাঁশি। সরু

ক্যানালের দু'পাশে ছায়াগাছ দেখতে পেলে কিছুটা দাঁড়ান। জলে মুখের ছায়া দেখুন। মুখোশ খুলে ছায়া দেখলে স্তব্ধতা স্পর্শ করবে।

এবার একটু বিশ্রাম চাই। ফিরে আসতে হবে। যার চোখে দেখেছি প্রথম, সে আমাদের কবিবন্ধু সন্তোষ। সন্তোষ চক্রবর্তী। এই দেখা, এই অনুভব ছড়িয়ে দিলাম আলতো মেঘের মত। ছুঁয়ে দেখতে পারেন। না ছুঁয়েও। তবে আরও একবার মনে রাখবার মত একটি বিষয় স্পষ্ট করি, এটা বেড়াবার জায়গা নয়। এখানে কোন 'স্পট' নেই। তাইই হয়তো এতটা স্নিগ্ধ, শান্ত .... চারের তিন অংশ ঘুমের পর দেখা স্বপ্নের মত। আসুন, একসাথে খুঁড়ে দেখি এর এখনও-না-দেখা দৃশ্যগুলোকেই।

পথনির্দেশ- কলকাতা -- বোলপুর -- পলসা (বীরভূম), পালিগ্রাম (পূর্ব বর্ধমান).

****

পুকরি লেক

মিহির দে

রোদেলা হাওয়ায় আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলছে। সবুজে পথ চিরে,কালো পিচ রাস্তা ধরে।পরিযায়ী পাখির ডানায় ভেসে এসেছে শীতের আগমন বার্তা।হালকা কুয়াশার পাদুর্ভাব দেখা যায় খুব সকালে।দমনপুর পেরিয়ে যেতেই মনটা বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। বনজ এক গন্ধ আমাদের জড়িয়ে ধরে। দূর থেকে জয়ন্তি পাহাড়কে খুব কাছে মনে হয়। মধুগাছ তলা,পানিঝোরা পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ায় পাম্পু বস্তির বটের ছায়ায়।সবুজ মাঠ, টংঘর, সাদা বকের দল।দোকানের ঘরিটা ঢং ঢং করে বেজে সময় জানিয়ে দিল।চা আর গরম ঘুঘনি খেয়ে পথ চলা শুরু।

রাজাভাতখাওয়া থেকে ছাড়পত্র নিয়ে প্রবেশ জঙ্গলের পথে।চারিদিকে সবুজে সবুজ।সবুজ ভেদ করে রোদ উঁকি দিচ্ছে পিচ রাস্তার উপর। কত প্রজাতির প্রজাপতি। এভাবেই চলতে চলতে এসে দাঁড়ালাম ২৩ মাইল শিব মন্দিরের সামনে। জঙ্গলের ভেতর এমন মন্দির মনকে ভিষণ ভাবে আকর্ষন করে। পাশেই পাকা করা বিশাল ওয়াচ টাওয়ার। এই জায়গাটা কোর এরিয়া হিসাবেই পরিচিত। বন্য জন্তুরা এখান দিয়েই সকাল সন্ধ্যা যাতায়াত করে।কপাল ভালো হলে দর্শন হয়ে যেতে পারে। ওয়াচ-টাওয়ার থেকে সমস্ত জঙ্গলটাই দেখা যায়। প্রকৃতির এক অন্য রুপ। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।নাম না জানা কত প্রজাতির পাখি এখানে দেখা যায়।দূর-দূরান্ত থেকে যুবকের দল এসে এখানে সারাদিন অপেক্ষা করে ছবি তোলার জন্য।

যাইহোক,আমাদের পথ চলা আবার শুরু হলো। যতই ভেতরের দিকে আমরা ঢুকে যাচ্ছি, ততই সবুজ আমাদের গিলে খাচ্ছে। এবার সান্তালাবাড়ি যাবার রাস্তাকে সোজা রেখে আমরা ডানদিকে ঢুকে পড়লাম জয়ন্তির দিকে।এখন বালা নদীর উপর সুন্দর ব্রিজ তৈরি হয়েছে। শীত কালে নদীতে জলের চিহ্ন বলতে নেই। শুধুই পাথর। এই নদী ভরা বর্ষায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এখান থেকে সোজা গাড়ি গিয়ে থামল বি.এস.এফ ক্যাম্পের এন্ট্রি গেটে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে জয়ন্তি পাহাড় যেন মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। যত বার আসি জয়ন্তি যেন নতুন রুপে ফিরে ফিরে আসে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন এক কথায় অসাধারণ। এই কারনে জয়ন্তিকে ডুয়ার্সের রানী ও বলা যায়।

হাতে অনেকটাই সময়।সকালের টিফিন শেষ করে নিলাম। এবার আমাদের গন্তব্য পুকরি লেক।বনবিভাগের একজন গাইড আমাদের সঙ্গে। বি.এস.এফ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে পুকরি লেকের দিকে। এই পথ কোর এরিয়া। তাই একজন গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। না হলে যেকোনো সময় বন্য জন্তুর আক্রমণ আমাদের দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। পথের দুপাশে প্ল্যান্টেশন করা সব গাছ। এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ।সমতল থেকে প্রায় ১২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পুকরি লেক। পুকরি কথার অর্থ হল পুকুর। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অনেক গল্প প্রচলিত এই পুকরি লেক কে নিয়ে। পুকুরের পাশে বেদিতে অসংখ্য ত্রিশুল। বুদ্ধ পূর্নিমার দিন এখানে মেলা বসে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়। পুকুরে রয়েছে অসংখ্য মাগুর মাছ। স্থানীয় মানুষ এই মাছ ও জলে প্রচুর বিশ্বাস। এখানে আসবার আগে নিচের বাজার থেকে কিছু মুড়ি নিয়ে আসা যেতে পারে এই মাছেদের খাবার হিসাবে। গা ছমছমে পরিবেশ। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।কান পাতলে যেন মনে হয় দৈব ঘন্টা বাজছে। অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে পুকুরের চারদিকে। এই রকম এক দৈব পরিবেশ মনকে অন্য এক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

পশ্চিমের আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে, তাই এবার ফিরে আসার পালা। স্বাভাবিক মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। পুকরি থেকে নেমে সোজা চলে এলাম প্রেমদার চায়ের দোকান।গরুর দুধের চা গ্লাস ভর্তি তার তৃপ্তিই আলাদা। এদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাইক নিয়ে সোজা বেরিয়ে এলাম জয়ন্তি থেকে।প্রকৃতির অন্য এক রুপ দেখা যায় এই সময়। বন্য জন্তুরা ফিরে আসতে থাকে জঙ্গলের দিকে। তাই কোথাও দাড়ানো মানেই বিপদের সম্মুখিন হওয়া। ক্রমশ অন্ধকার গ্রাস করছে সমস্ত বন পথকে। আমরাও হেডলাইন জ্বলা পথে ক্রমশ এগিয়ে চলছি শহরের দিকে।

কিভাবে যাবো:

যে কোন ট্রেনে আলিপুরদুয়ার পৌছে, ভাড়া গাড়ি নিয়ে সারাদিনের জন্য ঘুরে আসতেই পারেন জয়ন্তি ও পুকরি থেকে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে একটি সরকারী বাস ছাড়ে জয়ন্তির উদ্দেশ্য। বিকাল ৪ টায় সেই বাস ফিরে আসে।

কোথায় থাকব:

আলিপুরদুয়ার শহরে থাকার মত অনেক বেসরকারি হোটেল রয়েছে। এছাড়া সময় মত বুক করে গেলে জয়ন্তি থেকেও রাত কাটিয়ে আসতেই পারেন।

ঝরা পালকের রূপকথা

মৌসুমি দাশগুপ্ত

'আজি আমারই কথা
ওগো বিমনা সাঁঝে
তব স্মরণ বিনে
যেন বারেক বাজে,

যদি আঙিনা তলে
তব দীপালি জ্বলে
জ্বেলো একটি বাতি
মোরে স্মরিয়া লাজে।'

১৯৩৫ সালে কবি অজয় ভট্টাচার্যের কথায় সুর সাজিয়ে আগামী বাঙালী শ্রোতার ভুবনে যে করুণ নিবেদন রাখলেন তিনি বাংলা গানের জগতের 'সেই বিস্মরণের খেয়া ভরা পালে' পাড়ি দেওয়া হিমাংশু কুমার দত্ত... সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্ত। তখন বাংলা গানের একটা আলো কমে যাওয়া পড়ন্ত বেলার সময় যে দুর্বল গীত রচনা ততোধিক বিবর্ণ বিষাদ সুরে নিমগ্ন ছিল বাঙালী মন, রসের তৃষায় চাতকের মত ফটিকজলের কান্নায় আকূল সঙ্গীত মনের মানুষ, ঠিক সেই সময় তৃষার বারি সিঞ্চিত হল। বাংলার সঙ্গীতের জগতে সুরের সুরধুনী বয়ে নিয়ে এলেন এক দল সঙ্গীতস্রস্টা অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরোকায়স্ত, শচীনদেব বর্মণ এবং মধ্যমণি সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্ত। আশ্চর্যের ব্যপার হল এঁরা প্রায় সকলেই ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কুমিল্লার সন্তান। অরন্য-প্রান্তর, উদার দিগন্তলীন আকাশ আর নদী আর নৌকা, মাঝি মল্লার ছিল এঁদের পৃথিবী। সেখানে মাঠে মাঠে ধান, গাছে গাছে ফল, কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল, ডালে ডালে পাখি আর প্রাণে প্রাণে শুধু গান আর গান। এই সমস্ত অমূল্য উপাদানে পরিপূর্ণ আনিমগ্ন সুরবিমগ্নতায় উন্মন হিমাংশুর মহান আগমন ঘটল। সূচিত হল বাংলা গানের এক নতুন অধ্যায়।

বাড়ির দেওয়ালের এক কোণে পিতামহের বিবর্ণ ফটোগ্রাফের মত বিস্মরণের ধুলিহীন হিমাংশু দত্ত, অধুনা রসিকজন একে অন্যের সাথে অনেক অনুসন্ধান করে সেই নামের ক্ষীণ আভাস সংগ্রহ করে পায় অল্প স্বল্প সুরসাগরকে।সময়ের পরিহাস একদিন তিনিই ছিলেন যিনি সুরের ভগীরথ, বইয়ে দিয়েছিলেন সুরের সুরধুনী। হায় সময়, হায় কাল। সবই একদিন ভাঁটার টানে তলিয়ে যায় বিস্মরণের অতলে। বিক্ষিপ্ত স্মরণিকার চর্চাতে যেটুকু ফিরে পাওয়া যায় তাই বা কম কিসে! আগেই বলেছি, পূর্ববাংলার প্রান্তসীমায় ত্রিপুরা রাজ্যের কুমিল্লা শহরে তিনি জন্মেছিলেন। কৈশোরেই লেখাপড়ার সাথে সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন সঙ্গীতের চর্চায়। মা ছিলেন সু-গায়িকা। মায়ের প্রেরণায়, বাবার প্রশ্রয়ে ও যোগ্য সঙ্গীদের সাহচর্যে চলতে থাকল সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনার কাজ। ১৯২৪ খৃঃ কুমিল্লা স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হলেন। শুরু হল কলকাতার জীবন। খুব অল্প সময়েই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

১৯৩১ খৃঃ সংগীতে অনবদ্য অবদানের জন্য ভাটপাড়া থেকে তাকে সুরসাগর উপাধিতে ভূষিত করা হল। আজও পর্যন্ত রসিক মহল এই নামে একজনকেই চেনেন, তিনই হলেন সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্ত। তাঁর সঙ্গীতের মুল সুরটি ছিল করুণ রসে আর্দ্র, রোম্যান্টিক, কিঞ্চিত অভিমানের আভাসলীন। যেমন 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে' বা 'রাতের দেউলে জাগে বিরহী তারা', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে', 'ঝরা চামেলী বনে' গানটিতে। তিনি যেভাবে রাগ মিঞা মল্লারের ব্যবহার করেছেন অথবা স্বরচিত রাগে 'পুষ্প-চন্দ্রিকা' 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে' শুনলে বোঝা যায় শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর কতখানি দখল ছিল। আবার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মুর্ছনায় 'চাঁদ কহে চামেলী গো হে নিরুপমা' ছত্রে ছত্রে যে অভিমানের অন্তরালে সুগভীর প্রেম, তা আজকের এই প্রেমহীন যন্ত্রসর্বস্ব যুগের মানুষের মনেও ঘনিয়ে আনে বেদনার মেঘ।

সঙ্গীতের রসাস্বাদন তথা মূল্যায়ন কাগজের পাতায় পাতায় অক্ষর সাজিয়ে করা সম্ভব নয় ... এই রসানুভূতির একমাত্র স্থান হল শ্রবণ হতে হৃদয়ে... পদ্মা নদীর পাড় ভেঙে ভেঙে কত গ্রাম জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কে তার খবর রাখে।

কালের করাল গ্রাস থেকে যদি কত হিমাংশু, কত অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরোকায়স্ত আরও অনেক মনিমুক্তো উদ্ধার করতে পারা যায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান তদনুরূপ আয়োজনের মাধ্যমে বিস্মরণের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারা যায় সেটাই হবে সঙ্গীতের জন্য আমাদের সুমহান প্রায়শ্চিত্ত।

****

বাঙালির খাদ্যাভ্যাস: অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ...

চন্দ্রাশ্রী মিত্র

মানুষের খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘ সহস্র বছর ধরে মানব সভ্যতার সমান্তরালেই বিবর্তিত হয়েছে এই বিবর্তনের কার্যকর উপাদান হিসেবে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার স্থায়ী বসবাসের অভ্যাস, সেই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসও উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়েছে। তবে বিগত অল্প কয়েক দশকের বিশ্বায়নের প্রভাব তাকে পাল্টে দিয়েছে সর্বাপেক্ষা বেশি।

ভূমিভাগের প্রধান উৎপাদিত শষ্য ধান ও ব্যাপৃত জলভাগের প্রানীজ ফসল নিয়েই বাঙালির প্রধান খাদ্যের তকমা পেয়েছে 'মাছ-ভাত'।আজ থেকে তিন,চার দশক আগেও আম বাঙালির জলখাবারে চিড়া,মুড়ি,খই,মুড়কি,ও প্রধান আহারে ভাত শাক,ডাল,মাছই প্রাধান্যের জায়গায় ছিল।ধান্যে ভরা বাঙালির ভাঁড়ারেও ওই বীজ এবং তার বিভিন্ন প্রকরনই বিভিন্ন রুপান্তরে হাজির হয়েছে এযাবৎ। চাল-ভাজা,চিঁড়ে ভাজা,মোয়া,মুড়কি জলখাবারের বাটিতে রাজত্ব করছে কয়েক শতক। মোটামুটি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির গোয়ালে উৎপাদিত গো- দুগ্ধ,গাছের নারকোল আর ফল ফলারি এই জলখাবারের মেনুতে যোজন করেছে অনেকানেক লোভনীয় অভিনবত্ব।গোটা শীতকাল জুড়ে পিঠে পুলি, পায়েস, নাড়ু,হরেক কিসিমের শৈল্পিক মিস্টান্ন বাঙালি রসনাকে তৃপ্ত রেখেছে দীর্ঘদিন।

ব্রিটিশ দের হাত ধরে বেকারি শিল্প ঘাঁটি গাড়ে ভারতে। পাউরুটি,বিস্কুট বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আস্তে আস্তে সাবলীল হয় মধ্যবিত্ত বাঙালির রোজনামচায়। তবুও আমাদের ছোটবেলায় কেক-পেস্ট্রি সীমাবদ্ধ ছিল শীতের বড়দিনে বিশেষ উদযাপনের আবহে। রাস্তার পাশের দোকানের আলুর চপ,বেগুনি,সিঙ্গারার ভীনদেশী আত্মীয়রা এসে গেল গুটি গুটি পায়ে আটের দশক থেকে- চাউমিন,মোমো, এগরোল। বাঙালি অভ্যস্ত ও আগ্রহী হতে থাকলো এসবে।মফস্বল শহরে আমরা বাল্যে বা কৈশোরে বিরিয়ানি,চাপ এইসব নাম গুলো শুনে থাকলেও চোখে বা চেখে দেখিনি; সে উপায়ও ছিল না।আজ মধ্যবিত্ত বাঙালির বিয়েবাড়ি মায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও এসব জলভাত হয়ে গেছে।

খুব মনে পড়ে স্কুলে পড়ার সময় নিজের বা বন্ধুদের জন্মদিনের বাঁধা সিলেবাস লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম আর পায়েস। খুব উত্তেজক কিছু হলে পাঁঠার মাংস।ব্রয়লার মুরগী তখনো অজানা জিনিস।
কেকের ওপর মোমবাতিতে ফুঁ আর হ্যাপি বার্থডে জিঙ্গল্ বাঙালি যে কবে থেকে রপ্ত করে নিলো সেটাই বোঝা গেল না। মাথায় বড়দের ধানদূর্বার আশীর্বাদ আর মুখে দু চামচ পায়েসের জন্মদিন কোথায় যেন হারিয়ে গেল বাঙালির জীবন থেকে। বাঙালি হয়তো সবচেয়ে আয়েশহীন ভাবে সমস্ত প্রাদেশিক বা বৈদেশিক অভ্যেস, সে খাদ্যে হোক কি পোশাকে হোক কি জীবনচর্যার হোক , রপ্ত করে নিতে পারে সবচেয়ে সহজে।

নব্বইএর দশক থেকে ধীরে ধীরে পা ফেলে বিশ্বায়ন তার সমস্ত গুন ও দোষ সহ হৈ হৈ করে এখন বাঙালির জীবনকে, তথাকথিত বাঙালিয়ানাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। বাঙালি ক্যালোরি বুঝেছে, ভিটামিন শিখেছে, ইমিউনিটি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে খুউব।আর সবচেয়ে বেদনাদায়ক ভাবে উক্ত বিষয়গুলির বংশ পরম্পরায় শেখা প্রাকৃতিক উৎসের থেকে মুখ ফিরিয়ে চটজলদি লভ্য প্যাকেটজাত বানিজ্যিক উপাদানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সাবলীল।

পিলে রোগে বা জন্ডিসে (যখন এর এ.বি.সি.ডি জানা ছিল না) পেঁপে,পেটখারাপে থানকুনি-কালোমেঘ,গোটা শীতকালের সকালে একটুকরো কাঁচা হলুদের সাথে একটু আঁখি গুড়,নিম-শেফালির বড়ি এখন প্রাগৈতিহাসিক ..অবসোলেট। আমরা এখন অনলাইনে জিংক পাউডার,প্যাপাইন, কারকিউমিন ইত্যাদির ট্যাবলেট বা গুঁড়ো এনে ফেলেছি ব্রেকফাস্ট টেবিলে।চা সবুজ হলে যে তার কেরামতি এতো গুন বৃদ্ধি পায় তা বাঙালি কবে থেকে জানলো, ভিনিগার নামক বস্তুটির যে এতো প্রকরন হয় সেই রসায়ন বাঙালিকে শেখালো কে!

এক দশকের মধ্যে আম বাঙালির রান্নাঘর পরিনত হয়েছে কিচেনে। মাইক্রোওয়েভ, কনভেকশন আভেন তাকে শিখিয়েছে কেক, পেস্ট্রী,মাফিন,কুকিস বানাতে। চায়ের সঙ্গে মুড়ির এত দীর্ঘ দিনের আত্মীয়তাকে বাঙালি অবলীলায় করেছে অগ্রাহ্য।

টিনের চালে ঝমঝমে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শুকনো লঙ্কা দিয়ে মুড়ি ভাজা খেতে খেতে বাঙালি কতদিন মেঝেতে বসে লুডো খেলেনি, বাঙালি ভুলে গেছে। বাঙালি এখন অনলাইনে লেটুস পাতা কিনে গ্রীন স্যালাড বানায়, ড্রাগন ফ্রুটের লাল হৃদয় কুড়ে খায় চামচ দিয়ে,ব্রকোলি, স্প্রিং অনিয়ন এখন বাঙালির কিচেনে জলভাত। চাউমিন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বাঙালি এখন মোমো আর চিকেন স্যুপ খায় ডিনারে। নারকোল কোড়া আর চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে খেতে কেমন লাগে, বাঙালি আর জানে না। ঠা ঠা গ্রীষ্মের দুপুরে কাঁসার গেলাসে তেঁতুল লেবুপাতার ঠান্ডা সরবৎ যে কোন স্বর্গের বিনোদন, আধুনিকতার দোহাই দেওয়া বাঙালি ভুলে গেছে। আম বাঙালি কতদিন খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটেনি, কতোদিন কাঁচা আম নুন দিয়ে চেখে দেখেনি, বাঙালি ভুলে গেছে।

ট্রেডমিলে দৌড়োনো বাঙালি এখন ব্রেকফাস্টে ওটস/কর্নফ্লেকস/মুসলি খায়।গ্রীন স্যালাডের ওপর জলপাই তেল ছড়াতে ভালোবাসে। কিন্তু বাঙালি তো বাঙালিই।তার জিন তাকে ছেড়ে যায়নি। অম্বল, আমাশয়, পেট ফাঁপা, বুক ধরফর, এইসব থেকে বাঙালিকে উত্তীর্ণ করতে পারেনি তার খাদ্যের বিদেশি বিপ্লব। বাঙালির সঙ্গী তাই খালি পেটে এন্টাসিড, মুড়ি মুড়কির মতো আরো অজস্র ওষুধ। অথচ গবেষণা বলছে বাঙালি যদি এখনো ফিরে যায় তার দূরবর্তী অনাধুনিক অতীতের খাদ্যাভ্যাসে; প্রধান কৃষিজ উৎপাদ ধান এবং তার অন্যান্য তুতো ভাগে, বাঙালি ভালো থাকবে। বাঙালি সুস্থ থাকবে, বাঙালি বাঙালি থাকবে।।

****

ঔষধি গাছপালার উপকারিতা

বিনিতা সরকার

আমাদের গ্রাম বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ঔষধি গাছ পালা। সেগুলোর রয়েছে জীবনদায়ীনি ঔষধি গুণাবলী। অনেকেই হয়তো আমরা গাছগুলো চিনি আবার চিনি না। অনেকেই অবগত নই গাছগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে। আসলে গাছ যে মানুষের ভীষণ উপকারী বন্ধু সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষ সেভাবে সচেতন নয়। তারা নির্বিচারে গাছ কাটে, রাস্তা বানায়, কিন্তু সেভাবে গাছ লাগায় না। তবে যথেষ্ট পরিমাণে গাছপালা ও উদ্ভিদ না থাকলে মানুষের সমূহ বিপদ। বিভিন্ন রকমের গাছ রয়েছে আমাদের প্রকৃতিতে। আসুন আজ জেনে নিই আমাদের চারপাশে থাকা কিছু ঔষধি গাছপালা ও উদ্ভিদের কথা।

থানকুনি: আমাদের বাড়ির আশেপাশেই বাগানে, একটু জলা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে থানকুনি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। থানকুনি পাতা ভীষণ উপকারী। থানকুনি পাতা আমাশয় এর অব্যর্থ ঔষধ। প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণ থানকুনি পাতার রস সেবন করলে আমাশয় রোগের আরোগ্য হয়।

তুলসী: তুলসী পাতার উপকারিতা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গাছ থাকায় তুলসী পাতা খুব সহজেই পাওয়া যায়। সর্দি জ্বর কাশিতে তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে খেলে উপশম হয়। তুলসী পাতা পাকস্থলী ও কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তুলসী পাতাকে যৌবন ধরে রাখার টনিকও মনে করেন কেউ কেউ। তুলসী পাতা নার্ভেরও টনিক। শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দূর করে। হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। মানসিক চাপ কমায়। ত্বকের যে কোন রকম সমস্যায় তুলসী পাতা বেটে লাগালে কাজ দেয়। যে কোন প্রকার কামড়ে ক্ষতস্থানে তুলসী পাতা বেটে রস লাগালে জ্বালাপোড়া কমে।

অ্যালোভেরা/ঘৃতকুমারী: অত্যন্ত উপকারী একটা গাছ। এই গাছের গুণ এর শেষ নেই। অ্যালোভেরার রস সেবনে শরীরের অত্যন্ত উপকার হয়। এছাড়াও ত্বকের পক্ষে উপকারী। বিভিন্ন রকম কসমেটিকস বা প্রসাধন সামগ্রীতে আজকাল অ্যালোভেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে অ্যালোভেরার রস সেবন করলে পরিপাকতন্ত্র সতেজ থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, ওজন সঠিক থাকে।

নিশিন্দা: সর্দি জ্বর থেকে মুক্তি পেতে, কৃমির উৎপাত কমাতে, ক্ষয় রোগ থেকে বাঁচতে নিশিন্দা পাতা অত্যন্ত উপকারী। কানপাকায় নিশিন্দা পাতার রস দিলে উপশম হয়। টিউমারের চিকিৎসায় নিশিন্দা পাতা ব্যবহৃত হয়।

গুলঞ্চ: বাতজ্বরের চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী গুলঞ্চ। এছাড়াও জ্বর, নিদ্রা না হওয়া, শুষ্ক কাশ, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বারবার হাই ওঠা ইত্যাদি রোধকারী অতি উপকারী উদ্ভিদ গুলঞ্চ।

ঘেঁটু পাতা: গ্রামবাংলায় খুব সহজেই পাওয়া যায় ঘেঁটু পাতা। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় এই পাতার রস খুব উপকারী। দিনে তিনবার টাটকা ঘেটু পাতার রস সেবনে ম্যালেরিয়া রোগ থেকে উপশম হয়।

দূর্বা: দুর্বা বেটে এর রস ক্ষত স্থানে লাগালে রক্ত পড়া দ্রুত বন্ধ হয়। এছাড়াও চুলপড়া,চর্মরোগ দন্তরোগ, আমাশয়ের প্রতিরোধে দূর্বাঘাস সহায়তা করে। দূর্বা ঘাসের রস চিনি দিয়ে মিশিয়ে খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়ে যায়।

বাসক পাতা: বাসক পাতা রস করে মধু দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ালে সর্দি-কাশি ভালো হয়ে যায়। এছাড়া বাসক পাতার রস হাপানিতেও ভালো কাজে দেয়।

কুলেখাড়া: কুলেখাড়ার রস শরীরে রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে। কুলেখাড়ার পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।

পুদিনা: পুদিনা পাতার উপকারিতা অপরিসীম। পুদিনা পাতা বেটে বা পুদিনা পাতার শরবত বানিয়ে খাওয়া যায়। এটা আমাদের গ্যাস অম্বল বদহজম থেকে মুক্তি দেয়। এছাড়া তরকারিতে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গরমে ত্বকের জ্বালাপোড়া ও ফুসকুড়ি সমস্যায় কয়েকটি পুদিনার পাতা চটকে স্নানের জলে মিশিয়ে স্নান করলে ভালো কাজ হয়।

বাবলা: বাবলা গাছের কচি পাতা বেটে জলসহ খেলে উদরাময় রোগ সেরে যায়। কথিত আছে, বাবলা গাছের একটা ফুল বেটে খেলে অনেকদিন কলেরা হয় না। এছাড়াও বাবলা কোলেস্টেরল হ্রাস করে, এই ছেলের সেবন রক্তপ্রবাহের বাধা দূর করে, উন্নত চুলের ক্ষেত্রে ও কাশির ক্ষেত্রে খুব উপকারী।

আমলকী: আমলকী ফল অত্যন্ত উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণের দারুণ কাজ করে। দুটো শুকনো আমলকি ১০ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে ওই জল এক ঘন্টা সিদ্ধ করে নরম হলে চটকে চিনি মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হয়।

হরিতকী: আমলকির মতন হরিতকী ও খুব উপকারী। হরিতকীর গুঁড়া গরম জলের সাথে সেবন করলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। অন্ত্র পরিষ্কার করে এবং একই সঙ্গে দেহের শক্তি বৃদ্ধি করে। হরিতকী রক্তচাপ ও অন্ত্রের খিঁচুনি কমায়। অবসাদ দূর করে। হরিতকির গুঁড়ো নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে চুলে লাগালে চুল ভালো হয়।

বহেড়া: পেটের নানা রকম গোলযোগে বহেড়া খুব উপকারী। রক্ত রোধেও বহেরার গুড়ো ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও সাদা আমাশয় বা রক্ত

আমাশয় বহেড়া চূর্ণ উপকারী।

পাথরকুচি: পাথরকুচি পাতার রস রোজ সকালে খালি পেটে একটু চিনি দিয়ে সেবন করলে অম্বল গ্যাস বদহজম এসব সেরে যায়। মৃগী রোগের চিকিৎসায় পাথরকুচির রস ব্যবহৃত হয়। রোগী ফিট হলে যখন হাত পা বেঁকে যায় এবং দাঁত লেগে গেলে পাথরকুচি পাতা টাটকা রস রোগীকে খাওয়াতে পারলে খুব অল্প সময়ে রোগের সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসে। তবে এতে রোগের দীর্ঘকালীন নয় সাময়িক উপশম হয়।

কাঁটানটে: আমাদের গ্রাম বাংলায় প্রায়শই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কাঁটানটের শিকড় খোস পাঁচড়ার চিকিৎসায় উপকারী।

সজনে গাছ: সজনে ও সজনে পাতার রস দুটোই ভীষণ উপকারী। সজনে তো আমরা সবজি হিসেবে খেয়েই থাকি। প্রচুর খাদ্যগুণ রয়েছে তাতে। সাথে সজনে গাছের পাতার রস হাই প্রেসার কমাতে সাহায্য করে।

লজ্জাবতী: আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঝোপেঝাড়ে কখনো কখনো লজ্জাবতী গাছ দেখতে পাওয়া যায়। লজ্জাবতী গাছের পাতা ও মূল হাত পা জ্বালা থেকে মুক্তি দেয়। এছাড়াও অর্শ্ব রোগের চিকিৎসায়, আমাশয় ও ঘামের গন্ধ দূরীকরণে লজ্জাবতীর ব্যবহার হয়ে থাকে।

অর্জুন: অর্জুন গাছের ছাল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই ছাল জলে ভিজিয়ে সে রস সেবন করলে নানান রোগের উপশম হয়। অর্জুনের বাকল কোলেস্টেরল হ্রাস করে। এই ছালের সেবন রক্তপ্রবাহের বাধা দূর করে। এছাড়াও উন্নত চুলের জন্য ও কাশির উপশমে অর্জুন গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিম: জীবাণুনাশক হিসেবে নিমের সুনাম রয়েছে আদিকাল থেকে। নিম হলুদ একসাথে বেটে গায়ে লাগালে ত্বক জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়াও নিমপাতা ভেজে গরম ভাতের সঙ্গে খেলে উপকার হয়। কাঁচা নিমপাতা বেটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেকে যায়। আরাম পাওয়া যায়।

হলুদ: হলুদের সাথে ঘি মিশিয়ে লাগালে বিষফোঁড়া যন্ত্রণা কমে যায়। হলুদ মুখের লালিত্য ফিরিয়ে আনতে, ব্রণ নিরাময়ে, প্রমেহ রোগে, স্বরভঙ্গে, লিভার বা যকৃৎ এর দোষে, তোতলামি ভালো করতে, হাঁপানিতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে, পেটের গোলমাল সারাতে,ও ব্যাকটেরিয়া বিনষ্ট করতে হলুদ খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

কালমেঘ: কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। চলতি ভাষায় আলুয়া নামে পরিচিত। এর পাতা দিয়ে পচা ক্ষত পরিষ্কার করা হয়। কালো মেঘের পাতার রস কৃমিনাশক। রক্ত আমাশয় দূর করে। ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়াও ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অব্যর্থ ওষুধ। এটি আমাদের শরীরের ব্লাড সুগারের পরিমাণ কে কম রাখতে সাহায্য করে। শরীরকে সুস্থ সবল রাখে।

অশ্বগন্ধা: অনিদ্রায় খুব ভালো কাজ করে অশ্বগন্ধা মূল। অশ্বগন্ধা মূল শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঘি ও চিনি মিশিয়ে প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় খেলে অনিদ্রা দূর হয়। ভালো ঘুম হয়। এছাড়াও অশ্বগন্ধার মূল গরম দুধে চিনিসহ খেলে শিশুর কৃশতায় উপকার হয়।

ডালিম: ডালিম গাছের মূলের ছাল চূর্ণ করে দুধ ও মধু মিশিয়ে সেবন করলে শিশুর যকৃৎ বৃদ্ধিতে উপকার হয়। এছাড়াও অরুচিতে, রক্ত পিত্তে, কৃমিনাশক হিসেবে, হৃদ রোগে, অনিদ্রায়, মেধা বৃদ্ধিতে, যকৃত বৃদ্ধিতে ডালিম খুবই উপকারী।

অনন্তমূল: হাই ব্লাড প্রেসার কমাতে অত্যন্ত উপকারী। অর্শ্ব রোগের ক্ষেত্রে উপকারী। এছাড়াও অনন্তমূলের সেবনে খাবারে রুচি হয়, ক্ষুধা বাড়ে, খুসখুসে কাশির উপশম হয়, ঘামের দুর্গন্ধ দূর হয়, হাত পা জ্বালা কমে।

তরুলতা: পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যরা তরুলতার সমগ্র গাছকে অতিশয় তৃপ্তিকর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। গাছের ডাল ও পাতার শুকনো গুঁড়ো গাওয়া ঘি ও সমপরিমাণ চিনি মিশিয়ে রাতে শোবার আগে খেলে সুনিদ্রা হয়। এছাড়া স্বপ্নদোষের চিকিৎসায় ও ভালো কাজ দেয়।

ভৃঙ্গরাজ: ভৃঙ্গরাজ এর পাতা বেটে কপালে প্রলেপ দিলে দ্রুত মাথা ধরা সেরে যায়। চুলের যত্নে অত্যন্ত উপকারী ভৃঙ্গরাজ। চুল কালো করে, দীর্ঘ করে ও শক্তিশালী করে। স্নায়ুবিক দুর্বলতায় ফলপ্রদ।

বিশল্যকরণী: রক্ত বমির চিকিৎসা বিশল্যকরণী অত্যন্ত উপকারী ভূমিকা পালন করে। পেটে আলসারের জন্য রক্ত বমি, বুকের দোষের জন্য বমি অথবা কাশির বেগে রক্ত পড়া এছাড়া অতিরিক্ত রক্ত বমি করলে বিশল্যকরনীর আট থেকে দশটা পাতাপাতা বেটে সামান্য জল মিশিয়ে খাওয়ালে রক্ত বমি বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের হাতের কাছেই আছে রোগ থেকে সেরে ওঠার সেই মহার্ঘ্য সঞ্জীবনীগুলি। অথচ আমরা তাদের চিনিনা ও সঠিকভাবে তাদের প্রয়োগ জানিনা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদ সেবনের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।আমাদের উচিত ভেষজগুণ সমৃদ্ধ গাছগাছালিকে চেনা ও তাদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সচেষ্ট হওয়া। তাহলেই আমরা প্রকৃতির দেয়া এইসব অমূল্য আশীর্বাদের সদ্ব্যবহার করতে পারব।

****

তুলিকলম

কল্পনার সুতোয় বোনা

সুভম মুখার্জী, সহযোগী সম্পাদক

অবশেষে ঢাকে কাঠি পড়লো। প্রখর রোদে শুকিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে সিক্ত করে, রঙিন করে বর্ষা বিদায় নিলে। ঝলমলে নীল আকাশে সাদা তুলোর মত ডানা মেলে উড়ে যাওয়া মেঘকে হাতছানি দিয়ে কাশফুল গুলো আনন্দে দোল খেতে খেতে জানান দিলে "মা" আসছেন।

কঠিন সময় পেরিয়ে মায়ের আগমনের পূর্বে স্বাভাবিক জীবনের পথে আস্তে আস্তে আবার চলতে শুরু করেছে সক্কলে। তবু এই ঝলমলে দুর্গার হাসিমাখা আলোর ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে। কান পেতে শোনো মন দিয়ে, পাবে শুনতে, দুগ্গার কান্নার শব্দ। কখনো দুর্গার ভেতরের দুগ্গা কাঁদে, কখনো বা অন্য এক দুগ্গা। আরেক দুর্গা হাসে। কান্নার কারণ তো হাজারো। সেই অন্বেষণ না হয় আজ তোলা থাক। বরং আজ না হয় আমরা আগামী পরিবর্তনের লক্ষ্যে, 'দুগ্গা' দের ভালো রাখার লক্ষ্যে একটি শপথ গ্রহণ করি যে, যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কে আমরা তৈরি করব তাদের মনন হবে নির্মল, সর্বোৎকৃষ্ট। তারা শুধু দুর্গার হাসিতে হাসবে না, দুগ্গার চোখের জল মুছিয়ে হাসি ফোটাবে। তবে আজ থেকে শুরু হোক উৎকৃষ্ট মানুষ গড়ার পালা যার প্রথম ধাপ হোক শিশুমনে প্রকৃত সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষ যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে তার মন, সমৃদ্ধ হবে তার চরিত্রগঠন।

এই পথচলার প্রথম সিঁড়ি হোক সৃজনশীলতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। কল্পনার সুতোয় বোনা শিল্প নতুন রূপ দিক শিশুমনকে। দুগ্গারাও দুর্গার মতো করে বেড়ে উঠুক, অশ্রু মুছে মুখে ফিরুক নিষ্পাপ হাসি, শিল্পের হাত ধরে দূরীভূত হোক আলোর চাদরে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার। এই পথচলার সঙ্গী হতে চায় "তুলি-কলম", সঙ্গে থাকুক "হিরণ্যগর্ভ"। হাসি ফুটুক দুগ্গার মুখে, দুর্গার হাসির সাথে একসাথে আকাশ বাতাস মুখরিত হোক এই প্রার্থনায় প্রচেষ্টা হোক। দুর্গার মত দুগ্গারাও ভালোভাবে, সুস্থ মনে বাঁচুক।

****

রক্ষাকর্তা মা দুর্গা

তমাল দে

(বয়স: ১২ , জলপাইগুড়ি)

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুগ্গা আসবে তুমি কবে?
২০২০ র অক্টোবরে দুগ্গা পূজা হবে।
দুগ্গা মাগো আসবে তুমি এই বিশ্ব মাঝারে
দেখবে কত লোক মরছে রোজ হাজারে হাজারে ।

করোনা পরিস্থিতিতে আসবে , মা লক্ষ্মীর প্যাঁচা
গণশা কেতু বলবে আগে নিজের প্রাণটি বাঁচা!
সরস্বতীর হাতে সর্বদা থাকে একটি বীণা,
পুরোহিতের হবে টেস্ট করোনা পজেটিভ কি না?

এবার আদৌ মা দূর্গা অঞ্জলিটা নেবে?
ভার্চুয়ালি ভাবে এবার অঞ্জলি যে হবে !
অসুর বলে " চলো না মা আমরা এবার পালাই"
থাকুক ওরা নিয়ে এসব রোগ অসুখের বালাই।"
শুনেই মা গেলেন রেগে বলেন খাবি গোত্তা
এরাই নাকি মানে আমায় ওদের রক্ষাকর্তা
রক্ষা করব আমি ওদের দুর্গতিনাশিনী বললেন
তাইতো মা স্বপরিবারে মর্ত্যলোকে চললেন ।

মা আসলে সমগ্র ভুবন পুনঃ শান্তি পাবে
কোভিড নাইন্টিন এর আতঙ্ক নিমেষে সরিবে ।

****

শিশুশিল্প

অভিপ্সা ব্যানার্জি
(বয়স ৮)

উপাংশু রক্ষিত
(বয়স ৯)

দিবিজা হোড়
(বয়স ৬)

শিশুশিল্প

স্বাতন্ত্র্য সেনগুপ্ত
(বয়স ৪)

হৃদিকা দাস
(বয়স ৮)

রাজন্যা শীল
(বয়স ১১)

শিশুশিল্প

কঞ্জনাভ মৈত্র
(বয়স ৯)

রুদ্রনীল সরকার
(বয়স ৮)

শিশুশিল্প

অধ্যায়ন সরকার
(বয়স ১২)

সুমেধা চক্রবর্তী
(বয়স ১১)

আগামী সংখ্যা

পৌষ ১৪২৭ সংখ্যার জন্য লেখা আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

বিষয়: পিঠে পুলি নবান্ন, পৌষ মানে কি পূর্বাহ্ন?

লেখা জমা দেওয়া যাবে ২০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেবলমাত্র আমাদের ই-মেল (**hiranyagarvo@gmail.com**) করে। জমা দেওয়ার নিয়মাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইটের 'লেখা পাঠান' পাতাটি। আপনাদের মতামত জানাতে আমাদের লিখুন 'যোগাযোগ' পাতায়। বিষদ জানতে দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in

এছাড়া নিয়মিত দেখতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ: www.facebook.com/hiranyagarvo

সম্পাদকমণ্ডলী

শুভ্রদেব সেন, প্রধান সম্পাদক
পৌলোমি সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক
বীথি সরকার, সহযোগী সম্পাদক
মিহির দে, সহযোগী সম্পাদক
সুভম মুখার্জী, সহযোগী সম্পাদক
অভিশ্রুতি রায়, সহযোগী সম্পাদক

হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস
২৩/২০৫, VBHC Vaibhava
আনেকাল মেইন রোড, ব্যাংগালুরু, কর্নাটক, পিন – ৫৬২ ১০৬
ই-মেল: hiranyagarvo@gmail.com. ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in